

১৯২০ সালে তাসখন্দে কমিন্টার্নের দ্বিতীয় সম্মেলনে সিপিআই সৃষ্টির মুহূর্ত।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্টদের ন্যক্কারজনক ভূমিকা

ড: অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

তাসের ঘর ও ক্রেমলিনের সুতো

ইতিহাসের গতিপথ সর্বদা সরলরেখায় চলে না, বিশেষত যখন কোনো রাজনৈতিক দলের আদর্শগত কম্পাস স্বদেশের মাটি ছেড়ে বিদেশের নির্দেশে পরিচালিত হয়। ১৯২০ সালে তাসখন্দের মাটিতে মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং অবনী মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে যে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ভ্রূণ গঠিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে ১৯২৫ সালে যা কানপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত হয়, তার জন্মলগ্ন থেকেই এক অদ্ভুত ঐতিহাসিক স্ববিরোধিতা কাজ করছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যেখানে ছিল ভারতের নিজস্ব মাটি, সমাজ ও সংস্কৃতির বুক থেকে উঠে আসা এক জৈব আন্দোলন, সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শগত নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশ আসত সরাসরি মস্কোর কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল বা কমিন্টার্নের সদর দপ্তর থেকে। স্বদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের চেয়েও তাদের কাছে বেশি জরুরি ছিল আন্তর্জাতিক লাল শিবিরের ভূরাজনৈতিক স্বার্থ। ফলে যখনই মস্কোর স্বার্থের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের সংঘাত বেধেছে, তখনই ভারতের কমিউনিস্টরা এক ঐতিহাসিক ও নির্মম বেইমানির পথে পা বাড়িয়েছেন। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে ভারতের কমিউনিস্টদের এই সাম্রাজ্যবাদী তোষণ এবং স্বদেশের পিঠে কুঠারাঘাতের ইতিহাস আজ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক মহাতপ্ত অধ্যায়। এই রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও বিদেশি আনুগত্যের ধারাবাহিকতা কেবল ১৯৪৭ সালের দেশভাগের মধ্য দিয়েই শেষ হয়নি, বরং স্বাধীন ভারতের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রেও এর কুৎসিত রূপ বারবার উন্মোচিত হয়েছে।

প্রারম্ভিক দ্বন্দ্ব ও অসহযোগের অন্ধ গলি (১৯২৯–১৯৩৪)

এমন নয় যে ভারতীয় কমিউনিস্টরা প্রথম থেকেই ঔপনিবেশিক শক্তির মিত্র ছিল। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্টদের দমনে অত্যন্ত কঠোর নীতি নিয়েছিল। ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে ঐতিহাসিক মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ফিলিপ স্প্র্যাট এবং বেঞ্জামিন ব্রাডলির মতো দুই ব্রিটিশ কমিউনিস্ট-সহ মোট ৩২ জন বিশিষ্ট শ্রমিক ও কলোনিয়াল রাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কমিউনিস্ট নেতাকে গ্রেপ্তার

করা হয়। ব্রিটিশ সরকারের অভিযোগ ছিল যে, এই আসামিরা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ভারতে প্রবেশ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি শ্রমিক বিপ্লব এবং প্রলেতারিয়েতে অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য দেশজুড়ে গোপন চক্রান্ত চালাচ্ছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১-এ ধারায় অভিযুক্ত এই নেতাদের পক্ষে কংগ্রেসের শীর্ষ আইনজীবীরা সওয়াল করেছিলেন এবং এই দীর্ঘ মামলাটি ১৯৩৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত চলেছিল।

কিন্তু এই নির্যাতনের বিপরীতে কমিউনিস্টদের আচরণ ছিল চরম সুবিধাবাদী। ১৯৩০ সালের কমিন্টার্নের দশম প্লেনামের নির্দেশে যখন 'শ্রেণী বনাম শ্রেণী' এবং 'সোশ্যাল ফ্যাসিজম' তত্ত্ব আমদানি করা হলো, তখন ভারতের কমিউনিস্টরা নিজেদের দেশের স্বতঃস্ফূর্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিলেন। কমিন্টার্নের মুখপত্র 'ইমপ্রেকোর' বা 'ইন্টারন্যাশনাল প্রেস করেসপন্ডেন্স'-এ প্রকাশিত ১৯৩০ সালের 'খসড়া কর্মসূচি' অনুযায়ী ভারতের কমিউনিস্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেসের 'বুর্জোয়া সংস্কারবাদ' উন্মোচন করতে এবং মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহের তীব্র বিরোধিতা করতে।

এরই ফলশ্রুতি হিসেবে, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় যখন হাজার হাজার ভারতবাসী বুক পেতে ব্রিটিশের লাঠি ও বুলেট বরণ করছিলেন, তখন কমিউনিস্টরা আন্দোলনকে 'ধনীর স্বপ্নের চাল' আখ্যা দিয়ে এর থেকে দূরে সরে থাকেন। এমনকী তারা লবণ সত্যাগ্রহ বা সল্ট ট্যাক্স বাতিলের আন্দোলনকে ভারতীয় ধনী ব্যক্তিদের ও বুর্জোয়া শ্রেণীর একটি ক্ষুদ্র ও সুবিধাবাদী কৌশল বলে অভিহিত করেছিলেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তিকে তাঁরা ভারতীয় জনগণের স্বার্থের প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা বলে দেগে দেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল'-এ এই রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার কঠোর সমালোচনা করে লিখেছিলেন যে, উগ্র-বামপন্থী অতিবুদ্ধিজীবীরা নিজেদের বিপ্লবী দাবি করলেও স্বদেশের মূল গণ-আন্দোলনকে বুর্জোয়া আখ্যা দিয়ে চরম সংকটকালে ঘরের কোণে বসে রইলেন এবং প্রকারান্তরে ঔপনিবেশিক শাসনকে পরোক্ষ সুবিধা পাইয়ে দিলেন।

বিশ্বযুদ্ধের রঙ্গমঞ্চ ঃ রাতারাতি ভোলবদল এবং 'জনযুদ্ধ'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা পর্বে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ থেকে জুন ১৯৪১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে, কমিউনিস্টরা কমিন্টার্নের নির্দেশে এই যুদ্ধকে 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। তৎকালীন সময়ে বোম্বাইয়ের টেক্সটাইল মিলের ৯০ হাজার শ্রমিক ঐতিহাসিক ধর্মঘট (২ অক্টোবর ১৯৩৯)-সহ একাধিক ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে তারা এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিল। কিন্তু এই তথাকথিত আদর্শগত ধারাবাহিকতা ধূলিসাৎ হয়ে গেল ১৯৪১ সালের ২২ জুন। নাৎসি জার্মানি কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্টদের কাছে রাতারাতি সাম্রাজ্যবাদী শোষক ব্রিটিশ হয়ে গেল 'মহৎ মিত্র'।

পরাধীন ভারতের শৃঙ্খলমোচনের চেয়েও তাঁদের কাছে বড়ো হয়ে উঠল সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থ রক্ষা। তাঁরা আওয়াজ তুললেন—এই যুদ্ধ আর সাম্রাজ্যবাদীদের কামড়াকামড়ি নয়, এটি হলো সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতকে রক্ষার পবিত্র 'জনযুদ্ধ'। মস্কো থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড কমিউনিস্টদের কাছে নির্দেশ নিয়ে এলেন কুখ্যাত কোরিয়ার আছাড় সিংহ ছিনা ওরফে লারকিন, যিনি কমিন্টার্নের সরাসরি বার্তাবাহক হিসেবে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। এমনকী ভারতের তৎকালীন ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল নিজে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির হ্যারি পলিটের একটি দেওলি ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, মুজফফ্‌র আহমেদ ও বি.টি. রণদিভের হাতে পৌঁছে দিলেন। যেখানে নির্দেশ ছিল—অবিলম্বে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন বন্ধ করে যুদ্ধ উৎপাদনে সর্বাত্মক সাহায্য করতে হবে।

কমিউনিস্টরা রাতারাতি ঘোষণা করলেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এখন অপ্রাসঙ্গিক, ব্রিটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় কোনো 'শর্ত ছাড়াই' সর্বাত্মক সাহায্য জোগানোই হলো কমিউনিস্টদের প্রধান ধর্ম। প্রখ্যাত রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও গবেষক ডি. এন. গুপ্তার 'কমিউনিজম অ্যান্ড ন্যাশনালিজম ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া' গ্রন্থে এই ঐতিহাসিক বেইমানির নিখুঁত বিবরণ নথিভুক্ত রয়েছে। যেখানে দেখানো হয়েছে কীভাবে একটি দেশীয় রাজনৈতিক দল বিদেশের ভূরাজনৈতিক স্বার্থে নিজের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে চিরতরে স্থগিত করার ঘোষণা দেয়।

জোশী-ম্যাক্সওয়েল চুক্তি ঃ স্বরাষ্ট্র দপ্তরে বেইজিং ও মস্কোর কোলাকুলি

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি। ১৯৩৪ সাল থেকে নিষিদ্ধ থাকা কমিউনিস্ট পার্টিকে ১৯৪২ সালের ২২ জুলাই রাতারাতি বৈধতা দেওয়া হলো—যা ছিল ৮ আগস্ট কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণের ঠিক পনেরো দিন আগের ঘটনা। এই বৈধতা লাভের পর ব্রিটিশ সরকার দ্রুত জেলখানা থেকে বি. টি. রণদিভে, আর.এস.নিম্বকর, এস. জি পাটকর, এস. এস মিরাজকর এবং সাজ্জাদ জাহিরের মতো উগ্র কমিউনিস্ট নেতাদের মুক্তি দেয়, যাতে তারা বাইরে এসে জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করতে পারে। কমিউনিস্ট এবং তাদের সহযোগী এন. এম. জোশী পরিকল্পিতভাবে ব্রিটিশ সরকারের কাছে নিজেদের উপযোগিতা প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লাগলেন।

কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পূরণচাঁদ জোশী এবং ব্রিটিশ ভারতের স্বরাষ্ট্র সদস্য স্যার রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েলের মধ্যে একটি অত্যন্ত বিতর্কিত এবং গোপন সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়, যা ইতিহাসে 'জোশী-ম্যাক্সওয়েল প্যাক্ট' নামে



পরিচিত। প্রখ্যাত কলামিস্ট অরুণ শৌরির প্রামাণ্য গ্রন্থ 'দ্য ওনলি ফাদারল্যান্ড'-এ জাতীয় আর্কাইভের নথিপত্র ঘেঁটে প্রমাণ করা হয়েছে যে জোশী স্বরাষ্ট্র সচিব ম্যাক্সওয়েলের কাছে একটি ১২০ পৃষ্ঠার দীর্ঘ কর্ম-বিবরণী রিপোর্ট ও চিঠি পেশ করেছিলেন। এই রিপোর্টে জোশী গর্ব করে দাবি করেছিলেন যে, ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে দমন করতে এবং যুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট শিল্পে জাতীয়তাবাদীদের ধর্মঘট আটকাতে কমিউনিস্টরা ব্রিটিশ পুলিশের চেয়েও বেশি তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছে।

কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য এস. এস. বাতলিওয়ালার সাক্ষ্য অনুসারে (যা পরবর্তীতে বোম্বাইয়ের সংবাদমাধ্যমে বিস্তারিত প্রকাশিত হয়), এই সমঝোতার অধীনে কমিউনিস্টরা ব্রিটিশ সেনা গোয়েন্দা দপ্তরকে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা, রুট, গতিবিধি, আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্যদের মুভমেন্ট এবং বোম্বাই ও কলকাতার কলকারখানাগুলোর বিপ্লবী শ্রমিকদের নামের তালিকা বা ব্ল্যাকলিস্ট সরবরাহ করতেন। কমিউনিস্টরা ব্রিটিশ রাজের কাছে গর্ব করতেন যে তারা সফলভাবে জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোকে বিভক্ত করতে পেরেছেন। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক কে. কে. চৌধুরী তাঁর 'কুইট ইন্ডিয়া রেভল্যুশন : দ্য ইথোস অফ ইটস্ সেন্ট্রাল ডিরেকশন' গ্রন্থে লিখেছেন যে, জোশীর সেই ১২০ পৃষ্ঠার পারফরম্যান্স রিপোর্ট ভারতের স্বাধীনতার প্রতি এক চরম বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাঁর মতে, কোনো কুইসলিং বা সাম্রাজ্যবাদী দালালও ব্রিটিশের তোষণে এর চেয়ে নিখুঁত প্রতিবেদন তৈরি করতে পারত না। কমিউনিস্টদের নিজস্ব মুখপত্র 'পিপলস ওয়ার'-এর পাতায় জোশী গর্ব করে লিখেছিলেন, ''আমরা আমাদের স্ট্রাইক পলিসি পরিহার করেছি, কারণ আমরা একে জাতীয়তাবিরোধী এবং জাপানি আগ্রাসন- কারীদের সাহায্যকারী বলে মনে করি।''

নেতাজী এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের কদর্য চরিত্রহনন

কমিউনিস্টদের প্রচারপত্র 'পিপলস ওয়ার' সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ সরকারের অর্থ, কাগজ ও লাইসেন্সের বিশেষ অনুমতিতে প্রকাশিত হতো। এর তীব্রতা দেখে ১৯৪৩ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব স্যার রিচার্ড টটেনহ্যাম সন্তুষ্টি প্রকাশ করে ফাইলে নোট লিখেছিলেন, ''Better and better'' (আরও ভালো হচ্ছে)।

এই মুখপত্রে সবচেয়ে নোংরা ও কদর্য আক্রমণ শানানো হয়েছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের ওপর। যে বীর জওয়ানরা ব্রিটিশের জাঁতাকল থেকে ভারতকে মুক্ত করতে জীবন দিচ্ছিলেন, কমিউনিস্টদের চোখে তাঁরা ছিলেন 'দস্যু' ও 'দাবার বোড়ে'। প্রখ্যাত গবেষক টি. জে. নসিটারের 'মার্ক্সবাদ ইন আ মিক্সড ইকোনমি' গ্রন্থে এই কুৎসিত মিডিয়া প্রচারের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। 'পিপলস ওয়ার' পত্রিকার ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সালের প্রতিটি সংখ্যায় নেতাজীকে চিত্রিত করা হয়েছিল অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ কার্টুনের মাধ্যমে ঃ

১৯৪২ সালের ১৯ জুলাইয়ের কার্টুনে নেতাজীকে দেখানো হয় এক বিশ্বস্ত 'গাধা' হিসেবে, যার পিঠে চড়ে জাপানি প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো চাবুক মারছে।

১৯৪২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের কার্টুনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে দেখানো হয় নাৎসি প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলসের কোলে বসে থাকা এক 'নেড়িকুত্তা' হিসেবে।

১৯৪৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বরের কার্টুনে নেতাজী ছিলেন

জাপানি সাম্রাজ্যবাদী রাক্ষসের হাতের পুতুল বা এক বামন, যাকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি খেলাচ্ছে।

অন্যান্য কার্টুনে নেতাজিকে জাপানি যুদ্ধ দানবের মুখে ঢাকা একটি নিছক ফেয়ার-কালারড ফেস মাস্ক বা মুখোশ হিসেবেও দেখানো হয়, যার আসল উদ্দেশ্য ভারতের বুকে দাঙ্গা ও হত্যা ছড়ানো। কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম শীর্ষ নেতা বি. টি. রণদিভে ১৯৪২ সালের ৬ ডিসেম্বর 'পিপলস ওয়ার' পত্রিকায় সরাসরি লিখেছিলেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু হলেন 'জাপানি সাম্রাজ্যবাদের ডাকাত' এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ হলো 'লুটেরা ও ডাকাতদের একটি ভাড়াটে সৈন্যদল'। কেরালা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক পি. কৃষ্ণ পিল্লাই ১৯৪২ সালের ৪ অক্টোবর 'দেশাভিমানী' পত্রিকায় নেতাজীকে 'নর্দমার কীট' ও 'জাপানিদের কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়া ঘৃণ্য দেশদ্রোহী' বলে কুৎসা রটিয়েছিলেন। এমনকি বেইজিং রেডিয়োর সুরে সুর মিলিয়ে কমিউনিস্টরা দাবি করেছিল যে, সুভাষ বসু রেঙ্গুনের এক বিলাসবহুল প্রাসাদে জাপানিদের দেওয়া নোংরা টাকায় আমোদ-প্রমোদে মেতে আছেন। তবে সবচেয়ে বড়ো ও সুবিধাবাদী ভোলবদল ঘটে ১৯৪৬ সালে, যখন লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারকে কেন্দ্র করে সারা দেশে আবেগের বন্যা বয়ে যায়, তখন এই কমিউনিস্টরাই নিজেদের পাপ ঢাকতে নেতাজির মেকি জয়ধ্বনি দেওয়া শুরু করে।

১৯৪৩ সালের বঙ্গে দুর্ভিক্ষের সময় যখন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো জাতীয়তাবাদী নেতারা ২৫০টিরও বেশি ত্রাণ শিবির গড়ে তুলেছিলেন, তখন কমিউনিস্টরা ব্রিটিশের শস্য বাজেয়াপ্তকরণ নীতির সমালোচনা না করে কেবল 'হিন্দু মজুতদারদের' দায়ী করে ব্রিটিশ ও মুসলিম লিগের ইশপাহানি মিনিস্ট্রিকে সম্পূর্ণ আড়াল করেছিল, যা প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্রের 'থ্রি এসেস অন দি এনকোয়ারি' প্রবন্ধে কড়া সমালোচনার মুখে পড়ে। কমিউনিস্টরা গঠিত ফুড কমিটিগুলোতে আসলে স্টালিনের শস্য বাজেয়াপ্তকরণের অনুরূপ কাজই বাংলায় করছিল।

দেশভাগের চক্রান্ত ঃ 'অধিকারী থিসিস' (১৯৪২)

ভারতের ইতিহাসে কমিউনিস্টদের সবচেয়ে বড়ো অপরাধ হলো মহম্মদ আলি জিন্নার 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' এবং ভারতের ভৌগোলিক খণ্ডীকরণকে তাত্ত্বিক ন্যায্যতা প্রদান করা। ১৯৪২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে বিশিষ্ট কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী একটি প্রস্তাব পাশ করেন, যা ইতিহাসে 'অধিকারী থিসিস' নামে কুখ্যাত। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. সি. জোশী আর্কাইভে (File CPI-31/1942) সংরক্ষিত এই থিসিসটির মূল বক্তব্য ছিল—ভারত কোনো একটি একক রাষ্ট্র বা জাতি নয়; এটি আসলে আঠারোটি সার্বভৌম রাজ্যের এক কৃত্রিম জগাখিচুড়ি।

স্টালিনের ১৯১৩ 'মার্ক্সবাদ ও জাতীয় প্রশ্ন' নিবন্ধের বিকৃত অপব্যাখ্যা করে অধিকারী তাঁর ১৯৪৩ সালের পুস্তিকা 'পাকিস্তান অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিটি'-তে দাবি করেছিলেন যে, জিন্নার পাকিস্তানের দাবি কোনো সাম্প্রদায়িক দাবি নয়, বরং মুসলমান জনগণের 'প্রগতিশীল স্বাধিকার আন্দোলন'। এই থিসিসের ভিত্তিতেই কমিউনিস্টরা মুসলিম লিগকে 'প্রগতিশীল শক্তি' বলে ছাড়পত্র দেয় এবং সাজ্জাদ জাহির, আবদুল্লা মালিক ও দানিয়াল লতিফির মতো ধুরন্ধর কমিউনিস্ট নেতাদের আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম লিগে যোগ দিয়ে দেশভাগের আন্দোলনকে তাত্ত্বিকভাবে শক্তিশালী করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯৪৬ সালের ক্রিপস মিশন ও ক্যাবিনেট মিশনের কাছে দেওয়া স্মারকলিপিতে কমিউনিস্টরা দাবি করেছিল যে, ভারতকে একটি স্বাধীন দেশ না করে আঠারোটি অন্তর্বর্তীকালীন সার্বভৌম দেশে ভেঙে দেওয়া হোক, যা ছিল একটি কনফেডারেশন অব ইন্ডিপেনডেন্ট স্টেটস-এ ব্লুপ্রিন্ট। বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী লেখক ও প্রামাণ্য সমাজকর্মী খাজা আহমেদ আব্বাস পরবর্তীতে লিখেছিলেন যে, কমিউনিস্টরা মুসলমান বিচ্ছিন্নতা -বাদীদের হাতে তাত্ত্বিক অস্ত্র তুলে দিয়ে ভারতকে হত্যা করেছে।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং ১৯৬২-র চরম বিশ্বাসঘাতকতা

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হলেও কমিউনিস্টদের দেশবিরোধী চক্রান্ত থেমে থাকেনি। ১৯৪৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে জোশীকে সরিয়ে বি.টি.রণদিভে সাধারণ সম্পাদক হন এবং ক্রেমলিনের কোমিনফর্মের মুখপত্র 'ফর আ লাস্টিং পিস, ফর আ পিপলস ডেমোক্রেসি'-র নির্দেশে স্লোগান তোলেন—'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়'। তাঁরা স্বাধীন ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তেলেঙ্গানার সশস্ত্র বিদ্রোহের নামে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালানো হয়, যেখানে প্রায় ৪ হাজার গ্রামে সমান্তরাল 'গ্রাম রাজ্যম' গড়ে তুলে ভারতের ভৌগোলিক সংহতিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।

কিন্তু চূড়ান্ত বেইমানি ঘটে ১৯৬২ সালের ভারত–চীন যুদ্ধের সময়। বাম পার্টির উগ্র চীনাপন্থী অংশটি (যারা ১৯৬৪ সালে সিপিআই-এম গঠন করে), যার নেতৃত্বে ছিলেন হরকিষেণ সিংহ সুরজিৎ ও বাসভপুন্নিয়া, (উইকিলিকসের ডিক্লাসিফায়েড নথি ও সিআই-এর 'পলো' এবং 'সিজার' সিরিজের রিপোর্ট অনুযায়ী) তারা ১৯৫৯ সাল থেকেই ভারতের সীমান্তে চীনা দাবিকে সমর্থন করে আসছিলেন। যুদ্ধ শুরু হলে রণক্ষেত্রে আহত ভারতীয় জওয়ানদের রক্তের যখন তীব্র প্রয়োজন ছিল, তখন কেরলের প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা ভি. এস. অচ্যুতানন্দনের নেতৃত্বে কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কর্মী রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পলিটব্যুরো ও পার্টি এই রক্তদানকে 'সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী ও রাষ্ট্রতোষণ' আখ্যা দিয়ে অচ্যুতানন্দনকে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে শাস্তিস্বরূপ বহিষ্কার করে

এবং এক বছরের জন্য ব্রাঞ্চ লেভেলে নির্বাসিত করে। পরবর্তীতে ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ির সশস্ত্র হিংসাত্মক আন্দোলনের সময় চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'পিপলস ডেইলি' একে ভারতের বুকে 'বসন্তের বজ্রনিনাদ' বলে স্বাগতও জানিয়েছিল।

সার্বভৌমত্ব নিয়ন্ত্রণে সোভিয়েত ফান্ডিং ও কুৎসিত হস্তক্ষেপ

কমিউনিস্টদের এই নীতি ও কর্মসূচি কিন্তু কোনো অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক আলোচনার ফসল ছিল না, তা ছিল বিদেশি শক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাব ও অর্থায়নে পুষ্ট। ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসের ডিক্লাসিফায়েড মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআই-এর বিশেষ রিপোর্ট 'দ্য সোভিয়েতস ইন ইন্ডিয়া' পরিষ্কার তথ্যপ্রমাণ দিয়ে উন্মোচিত করেছে যে কীভাবে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম সরাসরি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ গোপন আর্থিক অনুদান ও কিক-ব্যাক স্কিমের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। মস্কোর এই আর্থিক সাহায্য দলটির জাতীয় আনুগত্যকে চিরতরে অবদমিত করে রেখেছিল। একই ধারায়, ১৯৭৬ সালের ২৪মে তারিখে প্রণীত সিআইএ মেমোরেন্ডাম 'ইন্ডিয়া : প্রেজেন্ট সিন, ফিউচার প্রসপেক্টস্' প্রকাশ করে যে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার সময়েও কমিউনিস্টরা (সোভিয়েত নির্দেশে কাজ করেছিল যাতে ভারতের সার্বভৌম অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক শক্তিকে দুর্বল করা যায় এবং স্বাধীন ভারতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ব্যাহত করা যায়।

উপসংহার ঃ ইতিহাসের কাঠগড়ায় লাল ইশতেহার

১৯৬৪ সালের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে দাঁড়িয়ে স্বয়ং ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, ''১৯৪২ সালের আন্দোলনে শামিল না হওয়া এবং পাকিস্তানের দাবিকে সমর্থন করা আমাদের চরম ভুল ছিল যা পার্টির ভাবমূর্তি চিরতরে ধূলিসাৎ করেছে।'' ২০০২ সালে নেতাজীর ১০৫তম জন্মবার্ষিকীতে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রকাশ্য জনসভায় দাঁড়িয়ে ক্ষমা চেয়ে বলেছিলেন 'নেতাজীর মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁকে দেশদ্রোহী বলা আমাদের ঐতিহাসিক ভুল ছিল।''

ইতিহাসের বিচার বড়ো নির্মম। যে দল একদা সর্বহারাদের অধিকার রক্ষার বুলি আউড়ে ভারতের জাতীয় সত্তা, সার্বভৌমত্ব ও সংস্কৃতিকে বারবার বিদেশি প্রভুদের ইশারায় বলি দিয়েছে, ইতিহাসের পাতায় তাদের কপালে চিরকালের জন্য এঁটে গেছে 'পঞ্চম বাহিনী' এবং 'সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত দালাল'-এর তকমা।

বিশেষ আকর গ্রন্থ ও রেফারেন্স নির্দেশিকা ঃ

এই প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রতিটির ঐতিহাসিক সত্যতা ও নথিপত্রের জন্য বিশ্বস্ত এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রেফারেন্স গ্রন্থের তালিকা দেওয়া হলো —

(ক) প্রধান ঐতিহাসিক আকরগ্রন্থ ও জাতীয় আর্কাইভ নথিপত্র

(১) Shourie, Arun. The Only Fatherland : Communists, 'Quit India and the Soviet Union, New Delhi ASA Publications, 1991.

জোশী ম্যাক্সওয়েল চুক্তির মূল চিঠিপত্র, ব্রিটিশ হোম ডিপার্টমেন্টের ফাইল এবং পি সি জোশীর ১২০ পৃষ্ঠার পারফরম্যান্স রিপোর্টের অনুলিপি সংবলিত সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ।

(২) Chaudhury, K K. Quit India Revolution : The Ethos of its Central Direction. Mumbai : Popular Prakashan, 1996.

ভারত ছাড়ো আন্দোলনকালে কমিউনিস্টদের ধর্মঘট দমন এবং ব্রিটিশ তোষণের চুলচেরা বিশ্লেষণ।

(৩) Gupta, D.N. Communism and Nationalism in Colonial India. New Delhi : Sage Publications, 2008.

১৯২০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শগত বিবর্তন ও জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতার চমৎকার বিবরণ।

(৪) Overstreet, Gene D., and Marshal Windmiller. Communism in India. Berkeley : University of California Press, 1959.

ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম দিককার আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ এবং কমিন্টার্নের প্রভাব নিয়ে ধ্রুপদী আকাদেমির কাজ।

(৫) Nossiter, T.J. Marxism in a Mixed Economy : Democratic Socialism in India. West London : Palgrave Macmillan, 1988.

কমিউনিস্টদের মিডিয়া প্রচার 'পিপলস্ ওয়ার' পত্রিকার কুরুচিপূর্ণ কার্টুন এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর চরিত্রহননের ঐতিহাসিক বিবরণ।

(খ) কমিউনিস্ট দলিল এবং নেতাদের আত্মজীবনী

(৬) Adhikari, Gangadhar. Paskistan and Indian National Unity, London : Communist Party of Great Britain, 1943.

দেশভাগের তাত্ত্বিক ভিত্তি বা 'অধিকারী থিসিস'-এর মূল মুদ্রিত দলিল।

(৭) Joshi, Puran Chand. Communist Reply to Congress Working Committee's Charges, Bombay : People's Publishing House, 1945.

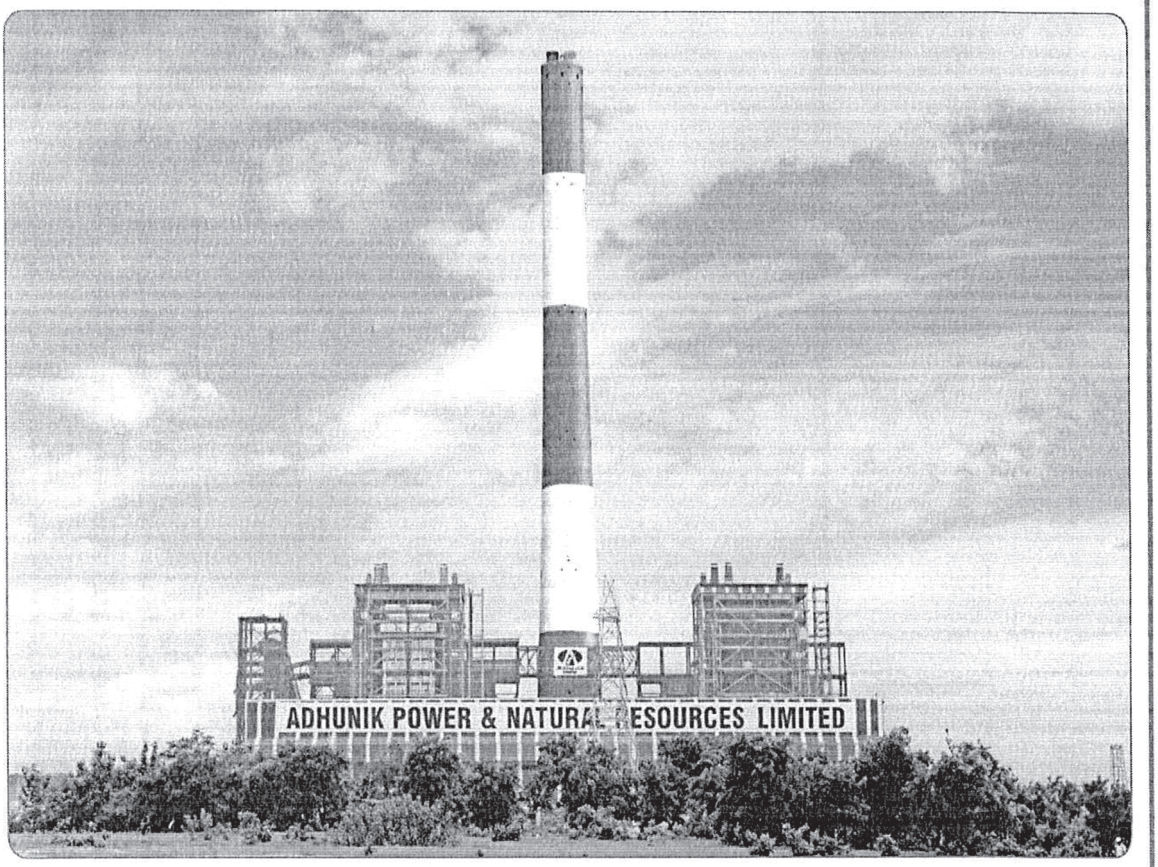
১৯৪৫ সালে কংগ্রেসের 'দালালি'র প্রত্যুত্তরে পি সি জোশীর সাফাই ও দ্বিচারিতার আত্মপক্ষ সমর্থন। ১৯৬২-র যুদ্ধে চীনপন্থী কমিউনিস্টদের আন্ডারগ্রাউন্ড কার্যকলাপ এবং রক্তদান বিতর্ক নিয়ে জ্যোতি বসুর নিজস্ব অভিজ্ঞতা।

Basu Jyoti. Memoirs : A Political Autobiography, Calcutta : National Book Agency, 1997.

১৯৬২-র যুদ্ধে চীনপন্থী কমিউনিস্টদের আন্ডারগ্রাউন্ড কার্যকলাপ এবং রক্তদান বিতর্ক নিয়ে জ্যোতি বসুর নিজস্ব অভিজ্ঞতা। □

Adhunik Power & Natural Resources Ltd

Adhunik Power And Natural Resources (APNRL) is an Independent Power Producer (IPP) owning and operating a 2x270 MW coal based thermal power plant in Padampur, Saraikela-Kharsawan, Jharkhand State. APNRL inaugurated its first unit of 2x270 MW coal fired thermal power plant.



Lansdowne Towers, 2/1A, Sarat Bose Road,
Kolkata, West Bengal, Bharat- 700020
website:info@adhunikgroup.com



বনবহ্নি— রানি শিরোমণি

নন্দলাল ভট্টাচার্য

... তেমন মুগুর।

কিছু নিলে যে কিছু দিতেও হয় সাহেব। না হলে যে মান থাকে না। মনে হবে বুঝি ভিক্ষে চাইছে।

এমন উত্তর আশা করেনি লেঃ ফার্গুশন। মেদিনীপুরে কোম্পানির সেনাপ্রধানের মুখের ওপর এমন কথা! তাও এক নেটিভ মহিলার। রাগে লাল মুখটা আরও লাল হয়ে ওঠে। মেজাজ হারানোর মুখে একটু থমকিয়ে তির্যকভাবে ফার্গুশনের প্রশ্ন, অর্থাৎ—

কর্ণগড়ের রানি শিরোমণিরও তেমনই বাঁকা সুরে উত্তর, তোমাদের প্রার্থনা মতো সেনা দিয়ে অবশ্যই সাহায্য করতে পারি। কিন্তু তার জন্য যে টাকা দিতে হবে।

—টাকা! আমাদের!

—হ্যাঁ তোমাদের। বেনিয়া তোমরা। মাল কেনা-বেচা করো, সেটা কি মুফতে হয়। তারজন্য দাম দিতে হয় না?

কথাটা শুনেই চিৎকার করে বলতে চায় লেঃ ফার্গুশন, এত স্পর্ধা! তাও সামান্য এক নারীর! জানে না কার সঙ্গে কথা বলছে! আমার কাছে টাকা চাইছে। আমরা যে দেশের রাজা, কথাটা কি ভুলে গেছে রানি! রানি কি জানে না আমরা টাকা নিই, দিই না।

মনে মনে এসব কথা বলে যেন একটু দম নেয় ফার্গুশন, তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলে, সরি! আমাদের সেনার দরকার নেই।

গজ গজ করতে করতে বিদায় নেয় লেঃ ফার্গুশন। ভাবে, বঙ্গের নবাবের মসনদ নিয়ে ব্যবসা করেছি আমরা। যাকে ইচ্ছে তাকেই গদিতে বসাচ্ছি চাহিদা মতো অর্থ পেতেই, সেই নবাবের অধীন এক জমিদারের কিনা এমন মেজাজ। কোথায় সাহায্য চাইছি বলে ধন্য হবে, তা না টাকা চাইছে! এত ঔদ্ধত্য! যোগ্য জবাব দেব এর।

ফার্গুশনের এহেন আস্ফালনের অবশ্যই কিছু কারণ আছে। অষ্টাদশ শতকের এই শেষপর্বে ভাগ্য ছিল ইংরেজের সহায়। সেনা বা শক্তি নয়, কূটবুদ্ধি, চক্রান্ত আর প্রতারণার পথ ধরে আজ তারা রাজা। পলাশিতে সিরাজের বিরাট বাহিনীকে হারিয়েছে কিছু নিমকহারামের হাত ধরে। ইংরেজ জানে, বিশ্বাসঘাতকরাই প্রকৃত ভরসা। শক্তিও।

পলাশিতে নবাবের সিপাহশলার মিরজাফর এবং কিছু বিশ্বাসঘাতক নিজেরাই এগিয়ে এসে হাত মেলায় কোম্পানির সঙ্গে। বেইমানি করে নবাব সিরাজকে হারায় হত্যা করে। বিদেশি বণিক ইংরেজকে জিতিয়ে দেশের স্বাধীনতাকেই বিকিয়ে দেয় লোভী চক্রান্তকারীরা।

শুরু হয় শোষণ, লুণ্ঠন

আর ইংরেজ ফাঁকতালে জিতে নামে এক বিচিত্র খেলায়। মিরজাফরকে নবাবের তখতে বসিয়ে আদায় করে বিরাট অঙ্কের নজরানা। নবাবের প্রায় পুরো কোষাগারটাই হয় বণিক ইংরেজের। আর তখনই মিরজাফরকেও সরিয়ে তখতে মিরকাশিমকে তারা বসায় আরও বেশি অর্থ পাবার আশায়।

মিরকাশিম নবাবের গদিতে বসে দেখেন, কোষাগার ফাঁকা। কোথা থেকে দেবেন টাকা? নিরুপায় মিরকাশিম নগদ অর্থের বদলে ইংরেজের হাতে তুলে দেয় মেদিনীপুর-সহ তিনটি জেলা। কোম্পানি হয় ওই তিন জেলার মালিক। সব রাজস্বই তাদের। এক অর্থে এদেশে ইংরেজের রাজা হওয়ার পথটা খুলে যায় এখান থেকেই।

ইংরেজ অবশ্য তারই মধ্যে দিল্লির মুঘল বাদশাহের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে সুবে বাঙ্গলার দেওয়ানি। আর সেই সঙ্গে শুরু হয়ে যায় তাদের লুঠ ও শোষণের পালা। নিত্যনতুন আইনের ফাঁসে তারা অধিকারচ্যুত করতে থাকে একের পর এক জমিদারকে। সেই রহিত করে নিষ্কর জমি ভোগের অধিকার।

তারই মধ্যে ঘটে ১৭৭০-এর মহা দুর্ভিক্ষ। প্রাণ যায় হাজার হাজার মানুষের। নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় গ্রামের পর গ্রাম। বঙ্গের তৎকালীন গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস লন্ডনে বড় কর্তাদের কাছে সবকিছু জানিয়ে বলেন বঙ্গের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশই কমে গেছে এই দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরে। তার ফলে কম আদায় হচ্ছে বার্ষিক রাজস্বও।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি পাওয়ার পরই যেনতেন প্রকারেণ এদেশ থেকে অর্থ লুণ্ঠনের খেলা শুরু করে। প্রতি বছরই তারা রাজস্ব আদায়ের একটি লক্ষ্য ধার্য করে। সেই লক্ষ্য মতো অর্থ আদায়ের জন্য তারা নানা ফন্দিফিকির বের করে কার্যত জমিদার থেকে সাধারণ মানুষ, জমিদারদের আমলে নিষ্কর জমির অধিকারী পত্রিক বা নানা শ্রেণীর নিম্নবর্গীয়দের উৎখাত করে এক অবর্ণনীয় অবস্থার সৃষ্টি করে। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ১৭৮৬-৬৯ খ্রিস্টাব্দে বার্ষিক রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ছিল ১৫,২৪, ৫৬৭ পাউন্ড। আদায় হয়েছিল লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্যমাত্রা একই থাকলেও আদায় হয় মাত্র ৬৫, ৩৫৫ পাউন্ড। রাজস্ব আদায় এত কম হওয়ার কারণ হিসেবে জানানো হয় দুর্ভিক্ষ-মড়কে বহু লোকের মারা যাওয়া বা দেশান্তরী হওয়ার কারণে বহু জমি অনাবাদী থেকে যায়। তাছাড়া ফসলের উৎপাদন কম হওয়ার কারণেও রাজস্ব আদায় কমেছে।

বিদ্রোহের সূচনা

রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য কোম্পানির সরকার যেসব ভূমি সংস্কার নীতি নেয় তাতে দেশের স্থিতিশীল কাঠামোটাই ভেঙে পড়ে। বহু জমিদার নিঃস্ব হয়। বহু কৃষক ও কৃষিকর্মী, পাইক ইত্যাদি কর্মচ্যুত, বাস্তুচ্যুত হয়ে কার্যত জীবন-মরণের প্রান্তে দাঁড়ায়। পরিণতিতে সব হারানো ওই মানুষগুলি বিদ্রোহ শুরু করে। চোরাগোপ্তা আক্রমণে তারা ইংরেজদের একেবারে নাজেহাল করতে শুরু করে। সেই বিদ্রোহ দমন করার মতো উপযুক্ত সৈন্য কোম্পানির ছিল না। সে কারণে তারা জমিদারদের নিজস্ব লেঠেল এবং সেনাদের সাহায্য চায়।

কোম্পানির তাঁবেদার একশ্রেণীর জমিদার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের সেই অনুরোধে সাড়া দেয়। ফলে তাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী দিয়ে নয়, তাঁরা নিজেরাও সাধারণ মানুষের ওই জাগরণকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করতে নিজেরাও দণ্ডধর হয়ে উঠেন। ইংরেজ সাধারণ মানুষের এই প্রতিবাদকে 'চুয়াড় বিদ্রোহ' বলে নিজেদের দাম্ভিকতারই পরিচয় দিয়েছে।

ওই রকম অবস্থায় অন্যান্যদের মতো কর্ণগড়ের রানি শিরোমণির কাছেও দূত পাঠায়। সেই দূতের কাছে সেনা পাঠাবার বিনিময়ে অর্থ চেয়ে বসেন রানি। আর তাতেই চটে লাল

ফার্গুসন। বিদ্রোহীদের পরিবর্তে তারা রানির বিরুদ্ধেই অভিযান চালায়। সেই অভিযান পর্বে যাওয়ার আগে বরং চোখ বোলানো যাক রানি শিরোমণির জীবনপাতায়।

কৃষক কন্যা হলো রাজরানি

পারাং নদীর তীরে ছোট্ট একটি গ্রাম আনন্দপুর। ছবির মতো গ্রামটি নানারকম গাছপালায় ছায়ায় ঢাকা। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষেরই জীবিকা কৃষি। সম্পন্ন না হলেও গ্রামের প্রতিটি পরিবারের মানুষ মোটামুটি খেয়ে পরে শান্তিতেই বসবাস করে।

বর্তমান কেশিয়াড়ির সেই গ্রামেরই এক কৃষক পরিবারের কর্তা বৈদ্যনাথ সরকার। বৈদ্যনাথের স্ত্রীর নাম শান্তিমণি। শান্তিমণির কারণেই পরিবারটির সব কিছুতেই রয়েছে একটা লক্ষ্মীশ্রী। গ্রামের সকলেই বলে, শান্তিমণির জন্যই সরকারদের এত সমৃদ্ধি। বৈদ্যনাথ ও শান্তিমণিরই মেয়ে শিরোমণি। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, কেবল শিরোমণি নয়, পরিবারের বড়ো মেয়ের নাম ভবানী।

এই দুই বোনকেই বিয়ে করেন কর্ণগড়ের রাজা অজিত সিংহ। তবে কিছু গবেষকের অভিমত, ভবানী ছিলেন বড়ো রানি। অজিত সিংহের প্রথম স্ত্রী। শিরোমণিকে রাজা বিয়ে করেন তুলনায় কিছু বেশি বয়সে। সেদিক থেকে শিরোমণি ভবানীর তুলনায় বয়সে অনেকটাই ছোটো। আর তাই সপত্ন নয়, প্রথম থেকেই ভবানী নেয় শিরোমণিকে দিদির মতো আগলে রাখার দায়। শিরোমণিও দিদিঅন্ত প্রাণ। অন্তঃপুরে নেই কলহ। তার থেকেই অনেকের ধারণা, দুই রানি বুঝি সহদোরা।

শিরোমণি ছিল ডাকসাইটে সুন্দরী। তৎকালীন গ্রামীণ পরিবেশে লেখাপড়া তেমন হয়নি। কিন্তু বুদ্ধি চাতুর্যে শিরোমণি ছিল এককথায় অসাধারণ। প্রথম থেকেই সে ছিল একটু ডানপিটে। গ্রামের বনে বনে ঘুরে বেড়াতো সে। কখনও বা পারাং নদীর ধারে বসে থাকত চুপচাপ। নদীর বহমান স্রোতের দিকে তাকিয়ে ভাবতো কত সব। সে সময় সে যেন এক আপনভোলা সাধিকা। কোনো দিকে হুঁশ থাকত না তার।

আবার হঠাৎ-ই একসময় উঠে যেত কোনো আমগাছে। ডাল ধরে দোল খেত। সে সময় তাকে মনে হতো যেন কোনো বনবালিকা। অরণ্যকন্যা। কেবল বনে বনে ঘুরে বেড়ানো নয়, ছেলের দলে মিশে করত দৌড়ঝাঁপ। নানা খেলাধুলা, লাঠিখেলা, তির-ধনুক বা গুলতি ছুঁড়ে আকাশে ভেসে যাওয়া পাখি মারা বা গাছের ফল পাড়া—এই সব আর কী । সব খেলাতেই শিরোমণি পাল্লা দিত ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে। তাই-বা কেন, সেই ছিল সেরা। তারই জন্য ছেলের দলেরও সেই মেয়েই ছিল সর্দার।

দলের একটি ছেলে কিন্তু শিরোমণির এই সর্দারিটা ঠিক মেনে নিতে পারত না। বারবারই তার মনে খচখচ করত একটা কথা, ছেলের দলের সর্দারি করবে কেন একটি মেয়ে? মেয়েরা তো সব সময়ই ছেলেদের মানবে। তাদেরই কথায় ওঠবোস করবে, এমনটাই তো নিয়ম। তাহলে এখানে কেন অন্যরকম হবে? আর তাই খেলায় থাকলেও ছেলেটি বেশ গম্ভীর হয়ে থাকত। একটু মুরুব্বি মুরুব্বি ভাব আর কী। তাই খেলুড়ে হলেও অন্য সকলেও তাকে একটু সমীহই করত।

শিরোমণি কিন্তু ছেলেটিকে সেভাবে পাত্তাই দিত না। বরং 'জ্যেঠামশাই' বলে তাকে খেপাতো। আর তাতেই মেজাজ হারাতো ছেলেটি। দল ছেড়ে দূরে বসে থাকত। শিরোমণিই তখন তার মান ভাঙাতো। হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যেত খেলার জায়গায়।

শিরোমণির ছেলেবেলার ওই সাথীটির নাম জনার্দন। ওরা এক গাঁয়েতেই থাকে। ছেলেটি অবশ্য বয়সে শিরোমণির চেয়ে বেশ কিছু বড়োই। কিন্তু মানুষের জীবনের সকালবেলার নিয়মটাই ওইরকম। দু'চার-পাঁচ বছরের কম-বেশিতে মেলামেশা বা খেলাধুলায় তেমন বাধা হলো না তার। একসঙ্গেই বাড়তে থাকে তারা। ছেলেটির রূপ যে কখন অনুরাগে গাঢ় হয়েছে তা জানে না সে। শিরোমণির মনেও সেই রঙের ছোঁয়া লেগেছিল কিনা তা জানা নেই। তবে কোনো কারণে ছেলেটি কোনোদিন না এলে সবকিছু কেমন যেন এক মনখারাপ করা বিষণ্ণতার গভীরে ডুব দিত। ভালো লাগতো না কিছুই। খেলা ছেড়ে বসে থাকত সে ওই পারাং নদীর পাড়ে।

এমনিভাবেই কাটছিল বেশ দিন। সকলেই আস্তে আস্তে বড় হয়। বাড়ির শাসন বাড়তে থাকে একটু আধটু করে। সেই বাঁধা বুলি—মেয়ে তুমি, এখন আর অমনভাবে ছেলেদের সঙ্গে মিশবে না। লোকে নানা কথা বলবে। তাই সমঝে চলো। একলা চলো।

শিরোমণি আর এখন ছেলেদের সঙ্গে খেলে না। মেশে না, সেভাবে অন্য মেয়েদের সঙ্গেও। অবশ্য মিশবে কী করে, তার সেইসব খেলার সাথীদের যে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে একে একে। আনন্দপুর ছেড়ে তারা যে সব চলে গেছে ভিন গাঁয়ে। তাই শিরোমণি একা।

একলা মেয়ের এখন আর সেভাবে বনেজঙ্গলে ঘোরাফেরা করা হয় না। নানা ধরনের বারণ তার পায়ে যেন শেকল হয়ে ওঠে। অবশ্য নদীর পাড়ে যাওয়ার বাধা নেই তার। একলা মেয়ে তাই সেখানে নদীর সঙ্গে কথা বলে। একাই বলে। কত না কথা। নদীর জলের মতোই সেই কলকলানি—সে-ই বক্তা—শ্রোতাও সে-ই।

নদীর ধার ছাড়া মেয়েটির যাওয়ার আর একটি জায়গা আছে। সেটাও অবশ্য নদীর দিকেই। কমলাসনা দেবীর মন্দির। সেঁউতি চাঁপা আর শিউলি ফুলের গাছে ঘেরা মন্দিরটি ছিল শিরোমণির খুবই প্রিয় জায়গা। যখন তখন চলে আসতো মন্দিরে। এ আসায় কোনো বাধা ছিল না, বরং ছিল এক ধরনের প্রশ্রয়ই।

মন্দিরের ফুলের বনে অথবা মন্দিরের চাতালে একলা মেয়ে শিরোমণি। সেই মন্দিরেই হঠাৎ হঠাৎ চলে আসত জনার্দনও। তার আসাটাও অবাধ।

এই যাওয়া আসার ফাঁকেই কখনও কখনও মুখোমুখি হয়ে যেত তারা। একটু হাসি—অল্প কথা। তারপরে আবার একলা হয়ে

যাওয়া। তারই মধ্যে আকাশে লাগতো রামধনুর সাত-সাতটা রং। জনার্দন রাঙা হতো। শিরোমণির মনেও কি লাগত রং? কে জানে। জানত না ঠিক জনার্দনও। তাই মনের কথা থাকত তার মনেই। কোনো দিনই সে কথা ডালপালা ছড়াতে পারত না আকাশে। কেমন একটা ব্যথায় চিন চিনিয়ে উঠত বুক। এক চিলতে হাসি যেন রাহু হয়ে গিলে খেত তার সব ব্যথা।

বয়স হচ্ছে শিরোমণির। রূপের ছটাও ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে তারই সঙ্গে তাল রেখে। একসময় কর্ণগড়ের রাজা অজিত সিংহের কানেও যায় রূপবতী শিরোমণির কথা। আর তার পরই দূত বা ঘটক পৌঁছে যায় শিরোমণির বাবা বৈদ্যনাথের দুয়ারে। এটাই ছিল সেকালের জমিদারদের একটা রীতি। প্রথমত, ছোটই হোক আর বড়ই হোক, প্রজারা জমিদারকে ডাকত রাজা বা রাজাবাবু বলে। আর তারই রেশ ধরে জমিদারের বউরা হতেন রানি।

দ্বিতীয়ত, সে সময় বহু বিবাহটা ছিল একটা মর্যাদার ব্যাপার। জমিদারদের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। দুই থেকে চার-পাঁচ জন স্ত্রী নিয়ে ঘর করতেন বহু রাজা-জমিদারই। আর এই বিয়ের ব্যাপারে পাত্রীর রূপটাই ছিল বড় কথা। কোন ঘরের মেয়ে বা তার বাবার আর্থিক অবস্থা কী তা নিয়ে মাথা ব্যথা ছিল না। কোনো প্রজার ঘরে সুন্দরী মেয়ে আছে খবর পেলেই চলে আসত ওই দূত।

তেমনই এক দূত কড়া নাড়ে বৈদ্যনাথের বাড়িতে। বলে, রাজা অজিত সিংহের কাছ থেকে আসছি। একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে।

রাজার দূত—বৈদ্যনাথ তো শশব্যস্ত। কী জানি কী করেছে সে। হয়তো চটে আছেন রাজামশাই। সেটা জানাতেই এসেছে কি দূত? তাই প্রায় গলায় গামছা দিয়ে একটু হেঁট হয়েই শুধোয় বৈদ্যনাথ, কী কথা? কী বলেছেন রাজা বাহাদুর।

বৈদ্যনাথের ভাব দেখে দূতের বেশ মজাই লাগে। তাই গম্ভীর হয়ে গিয়েও হেসেই ফেলে সে দূত। হাসি মুখেই বলে, রাজামশাই আপনার মেয়েটিকে চেয়েছেন।

এই চাওয়া কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারে না বৈদ্যনাথ। তাই খুব নরম আর নীচু গলায় বলে তাকে, চেয়েছেন—কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারলাম না! তাই যদি —

—আরে ঘাবড়ার কিছু নেই। আপনার মেয়ে— ওই শিরোমণি যার নাম, রাজামশাই তাকে বিয়ে করতে চান। এখন আপনি যদি রাজি থাকেন—

দূতের কথা শেষ হবার আগেই বৈদ্যনাথ বলেন থাক থাক, আর বলতে হবে না কিছু। কিন্তু তিনি আমার মেয়েকে!

—জানেনই তো আমার অবস্থা।

—তিনি সব জানেন। জেনে শুনেই প্রস্তাবটি পাঠিয়েছেন। শুধু শোনা নয়, কমলাসনার মন্দিরে একদিন আপনার মেয়েকে দেখেওছেন,ভারি পছন্দ তাঁর—

রাজার পছন্দে প্রজা আর না বলে কী করে। তাই অন্য কারও সঙ্গে কোনো কথা না বলেই বৈদ্যনাথ বলে, এ তো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। এতে আমার আপত্তির কোনো জায়গাই নেই। আমি রাজি, রাজি এই বিয়েতে।

তাহলে বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করে নেওয়া যাক। কথাটা বলেই ঝোলা থেকে পাততাড়ি বের করে কীসব আঁক কষে বিয়ের দিন ঠিক করে বিদায় নেয় দূত। আর সেই নির্দিষ্ট দিনেই রাজা অজিত সিংহের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় শিরোমণির।

আশীর্বাদ—সর্বনাশ

বিদায়ের আগে কমলাসনার মন্দিরে যায় শিরোমণি। দেবীকে প্রণামের পর বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে শিরোমণি। দেখে চারিদিকটা। এই মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার জীবনের বহু স্মৃতি। অদ্ভুত এক স্মৃতিমেদুরতায় মগ্ন শিরোমণি। হঠাৎ-ই তার চোখ চলে যায় মন্দিরপ্রাঙ্গণের এক কোণায়। সেখানে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন। মুহূর্তের দ্বিধা। ধীরে ধীরে সেই মূর্তির দিকে এগিয়ে যায় শিরোমণি।

মুখোমুখি দু'জন। এক তরুণী আর এক তরুণ। কোনো কথা নয়। কেবলই তাকিয়ে থাকা। শিরোমণি দেখছে সেই মূর্তিকে। সে মূর্তি জনার্দনের। শিরোমণির মনে হয়, তার সামনে দাঁড়িয়ে এক পাথরের মূর্তি। স্থির নিষ্পন্দ। পলকহীন তার দু'টি চোখ থেকে যেন বেরিয়ে আসছে তীব্র এক আলো। সে আলো যেন দগ্ধ করতে চায় তাকে। কিন্তু কেন? বুঝতে পারে না শিরোমণি। তাই তাকিয়েই থাকে তার দিকে।

দেখছে জনার্দনও। রুক্ষ দুই চোখে। দেখছে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে শিরোমণি। সেই-সেই মেয়েটি—পারাং নদীর মতোই যে ছিল উচ্ছল। কিন্তু আজ যেন ধীরে বয়ে চলেছে পারাং। তরঙ্গহীন, যেন কোনো গভীর বেদনার ভার নিয়ে সে স্থির। ঠিক তেমনি তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই শিরোমণি। তার সিঁথিতে আজ টকটকে লাল সিঁদুর। লাল বেনারসি আর সোনার অলংকারে ভরা শিরোমণিকে যেন চেনাই যায় না। কৃষক ঘরের মেয়ে আজ রাজরানি। তাই কি অজানা কোনো অহংকারে এমন স্থির। জনার্দন ভাবনায় উত্তাল।

নিশ্চল ওই দুই মূর্তির মধ্যে শিরোমণিই প্রথম সচল। নীচু হয়ে প্রণাম করে জনার্দনকে। বলে আমি চলে যাচ্ছি।

কোনো কথা বলে না জনার্দন। তাকিয়ে থাকে সে একই ভাবে। শিরোমণি বলে, কই আশীর্বাদ করলে না তো!

—আশীর্বাদ!

—প্রণাম করলে তো আশীর্বাদই করতে হয়।

—আশীর্বাদের ভার বইতে পারবে তো।

জনার্দনের এহেন কথায় থমকে যায় শিরোমণি। বুঝতে পারে না তার কথার অর্থ। তাই পলকের জন্য নিস্তব্ধতা। তারপর হাসিমুখেই বলে, বেশ তো, তোমার যেমন ইচ্ছে তেমন আশীর্বাদই করো। আমি সব কিছুই মেনে নিতে তৈরি।

—তাহলে শোনো—কেমন যেন হিসহিসিয়ে ওঠে জনার্দনের

গলা। ওই তীক্ষ্ণস্বরে শিরোমণি যে ভয় পায় না তা নয়, তবুও হাসি হাসি মুখেই বলে, কই করো আশীর্বাদ।

—তোমার সর্বনাশ হোক!

চমকে ওঠে শিরোমণি। অনেক কিছু ভাবলেও এমন ভয়ংকর আশীর্বাদের জন্য তৈরি ছিল না শিরোমণি। আশীর্বাদ শুনে যেন বিবশ হয়ে যায় শিরোমণির সারা শরীর। তবে সে এক পলকেরই জন্য। তারপর শিরোমণি যেন আবার স্বাভাবিক হয়। বলে, তুমি যাই বলো সেতো আশীর্বাদই। আমি তোমার এই আশীর্বাদ মাথা পেতে নিচ্ছি। যতো ভয়ংকরই হোক, আশীর্বাদ—আশীর্বাদই হয়। শুধু একটা কথা—

—কী?

—তোমার মনে যে এসব ছিল কোনোদিন বলোনি তো?

—সব কথা কি বলতে হয়!

—কিছু কিছু কথা তো বলতেই হয়, তাই না! যাইহোক এবার আমায় বিদায় দাও। আর বোধহয় আমাদের দেখা হবে না।

—সব কিছুই কি এভাবে বলা যায়। যায় না। যাইহোক, এবার তুমিও আমাকে বিদায় দাও।

কথাটা শুনে কিছুটা অবাক হয়েই শিরোমণি বলে, বিদায়! তুমি আবার কোথায় যাবে?

—আমি আর এ সংসারে থাকবো না। এই গ্রাম ছেড়ে আমিও চলে যাচ্ছি। সন্ন্যাস নিয়ে আমি সাধনায় বসবো। আমার কথা আমাকে রাখতেই হবে।

জনার্দনের এহেন সিদ্ধান্তের কথায় শিরোমণি বিচলিত। একটা অপরাধবোধ জেগে উঠল তার মধ্যে। মনে হলো, জনার্দন যে কথা মুখ ফুটে বলতে পারেনি, তার উচিত ছিল সেকথা বোঝা। আর এই না বোঝার ব্যর্থতার জন্যই আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে, না—যেও না, যেও না তুমি সংসার ছেড়ে—এই প্রাণ ছেড়ে।

জনার্দন বলে, আজ আর তা সম্ভব নয়। আজ আর তোমার কোনো কথাই আমি শুনব না। তাই-বা কেন, আজ তোমার কথা শোনার কোনো বাধ্যকতা নেই আমার। তাই বিদায় জানাই তোমাকে, তুমিও বিদায় জানাও আমাকে। কথাগুলি বলতে বলতে পা বাড়ায় জনার্দন।

জনার্দনের সেই চলে যাওয়া মূর্তিটা দেখতে দেখতে জল আসে শিরোমণির চোখে। সেকথা লেখা নেই কোথাও।

সেদিনই আনন্দপুর ছেড়ে পতিগৃহে যাত্রা করে শিরোমণি।

—কর্ণগড়ের নতুন রানি। মন্দিরে তখন বাজছে ঘণ্টা—বাজছে ঢাক—রণিত হচ্ছে বুকভাঙা কান্নার বিষাদ মাখা সুর—যেও না —যেও না—।

বধূবরণ

বধূবরণের জন্য সেজে উঠেছে কর্ণগড় দুর্গ। রাজা অজিত সিংহ যে আবার বিয়ে করেছেন, এতে সবচেয়ে বেশি খুশি গ্রামের প্রজারা। বেশ কিছুদিন ধরেই তাদের মনে জমে উঠছিল একটা ভয়ের কালো মেঘ। প্রজাদের ভয়, রাজা অজিত সিংহের অবর্তমানে কে রক্ষা করবে তাদের? কে হবে রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

তাদের ভয়ের কারণ, রাজা এখনও নিঃসন্তান। বিয়ে হয়েছে তাঁর বহুদিন। কিন্তু রানি ভবানী এখনও কোনও সন্তানের জন্ম দিতে পারেননি। তৎকালীন সামাজিক রীতিতে এই সন্তান না হওয়ার জন্য আর সকলের মতো প্রজারাও দায়ী করেন রানি ভবানীকেই। সকলেই মনে করে রানি বন্ধ্যা। তাই রাজ্যরক্ষার জন্য, সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারীর জন্য রাজার আবার বিয়ে করা উচিত।

নিজের আপনজন, সভাসদ ইত্যাদির মতো প্রজারাও তাঁর সন্তানহীনতার জন্য চিন্তিত, শঙ্কিত—একথা রাজা অজিত সিংহও জানেন। কিন্তু রানি ভবানীকে তিনি সত্যিই খুব ভালোবাসেন। আর সকলের মতো ওই সন্তান হীনতার জন্য কেবল ভবানীকেই দায়ী করতে চান না। তাঁর মনে একটা প্রশ্ন, গলায় বেঁধা মাছের কাঁটার মতো সবসময় খচখচ করে। তাঁর নিজের সম্পর্কেই ওঠে প্রশ্নটা। কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারেন না। তিনি জানেন, এমন কথা যদি প্রকাশ পায় তাহলে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সব রাজা জমিদাররাও সক্রিয় হয়ে উঠবে। তাতে জীবিত অবস্থাতেই হয়তো রাজ্যহারা হবেন তিনি। তাই চুপ থাকেন তিনি। ওইসঙ্গে আবার বিয়ে না করার ব্যাপারেও ছিলেন কৃতসংকল্প।

কিন্তু সবকিছু তাঁর ওলটপালট হয়ে যায় শিরোমণিকে দেখার পর। তারই জমিদারির মধ্যে পড়ে আনন্দপুর গ্রামটা। আর সেই সূত্রেই তিনি গিয়েছিলেন সেই গ্রামে। সেখানেই দেখেন তিনি শিরোমণিকে। দেখেই মনে হয়, যেন বহ্নিশিখা। পতঙ্গের মতোই ওই আগুনে ঝাঁপ দিতে চায় মন। তাই সংকল্পচ্যুত হলেন। কর্ণগড়ে ফিরেই সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেললেন, দ্বিতীয় বিয়ে করবেন তিনি। সে কথাটা প্রথমেই জানালেন ভবানীকে।

সব শুনে ভবানী কিন্তু এতটুকু বাধা দেন না। বরং এতদিনে রাজা যে মত বদলেছেন এতে তিনি খুশিই। সেকালে সাধারণ মানুষই যেখানে একাধিক বিয়ে করে, সেখানে রাজা-জমিদারদের বেলা তো কথাই নেই। বিশেষ করে সন্তানহীনতার ক্ষেত্রে। আর অন্যদের মতো তিনিও তো চিন্তিত এই রাজত্ব বা জমিদারির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী নিয়ে। তিনিও চান, রাজা আবার বিয়ে করুক। এখন রাজা যে আরেকটা বিয়ে করতে চাইছেন তা শুনে সবচেয়ে খুশি হলেন তিনিই। বলেন, মনে যখন ধরেছে, তখন তাড়াতাড়ি তাকে ঘরে তোলার ব্যবস্থা করো।

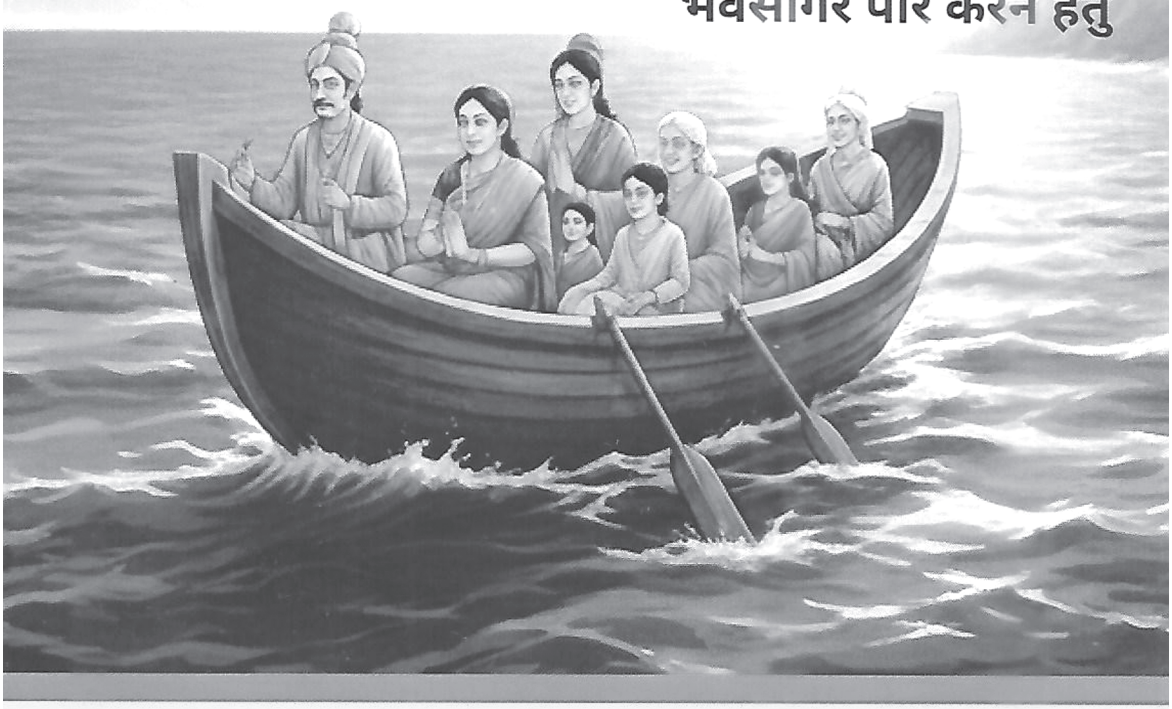
ভবানীর একথায় অজিত সিংহের সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর হয়। ভবানী যে তাঁকে এমনভাবে সমর্থন করবে তা ভাবতেও পারেননি তিনি। এবার তাই মুগ্ধ মনেই দূত পাঠান আনন্দপুরে। এবং তার পরের ঘটনাগুলিরই পরিণতি এই বধূপ্রবেশ বা বধূবরণের উৎসব।

ঐতিহ্যের প্রতীক কর্ণগড়

গ্রামের সাধারণ কৃষক ঘরের মেয়ে শিরোমণি। গ্রামে অনেক

कुटुंब प्रबोधन

जीवन यात्रा की नौका है परिवार,
जिसमे हम सात जन साथ हैं,
भवसागर पार करने हेतु



लक्ष्य

संयुक्त परिवार	संगठित, सशक्त, सुरक्षित परिवार
स्वस्थ परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
सुसंस्कृत परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
आदर्श परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार

বিয়ে বা বধূবরণ দেখেছে সে। তাদের মধ্যে বৈভবে যারা কিছুটা উঁচুতলার তাদের বিয়ে কিংবা অন্য অনেক আনন্দ উৎসবও দেখেছে। নানা ধরনের বাজনা আর সশস্ত্র সেনাদের কুচকাওয়াজের মধ্যে গড়ে প্রবেশ করার সময় মুহূর্তের জন্য হলেও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে শিরোমণি। দু'চোখ মেলে জরিপ করে সব। সেই এই কর্ণগড় সম্পর্কে একদিন যেসব কথা শুনেছে, সেগুলিই মনে করতে থাকে শিরোমণি।

কর্ণগড়। নামটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে পৌরাণিক, মহাকাব্যিক এবং নানা ঐতিহাসিক কাহিনি। সেসব কাহিনির সঙ্গে আজকের কর্ণগড়ের অনেক কিছুরই তেমন মিল নেই। তবুও কর্ণগড় তার চোখের সামনে যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন নানা ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে।

পুরাণ কাহিনি মতে, শিবহীন দক্ষযজ্ঞে পতির অবমাননায় শিবানী সতী করলেন দেহত্যাগ। তাঁর সেই দেহ নিয়ে শিব শুরু করেন তাণ্ডব নৃত্য। সে নৃত্যে সৃষ্টির বিনাশ হয়ে ওঠে অনিবার্য। সৃষ্টির রক্ষায় দেবতাদের প্রার্থনায় শিবকে শান্ত করতে বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্রে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেন সতীর দেহ। সতীর দেহের বিভিন্ন অঙ্গ যেখানে যেখানে পড়ে তা আজ মহাতীর্থ সতীপীঠ। সুদর্শন চক্রে ছিন্ন সতীদেহের কান বা কর্ণমূল এসে পড়েছিল মেদিনীপুরের শালবনির কাছে। সেই জায়গাই আজকের কর্ণগড়। সতীর কান বা কর্ণমূল পড়েছিল বলে জায়গার নাম হয়েছিল কর্ণপুরি। কিন্তু পরবর্তীকালে এখানে রাজাদের দুর্গ বা গড় প্রতিষ্ঠার কারণে কর্ণপুর হয়ে যায় কর্ণগড়।

শোনা যায়, মহাভারতের কর্ণ, যিনি ছিলেন অঙ্গরাজ, তিনিই এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। আর তারপরেই এই জায়গাটার নাম হয় কর্ণগড়। অন্যরা অবশ্য বলেন, এটি নেহাতই লোককথা। এই জায়গার সঙ্গে মহাভারতের কর্ণের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু তা বলে তো থেমে থাকে না লোক কাহিনির ডালপালা লেখা। আর তাই দাতা কর্ণের এই দুর্গেই নাকি একসময় বাস করেন পাণ্ডবরাও।

পৌরাণিক এইসব বিবরণে সত্যি-মিথ্যে দুই-ই থাকতে পারে। কিন্তু একথা সত্যি, জায়গাটা মোটেই আধুনিক নয়। এর অস্তিত্বের শিকড় রয়েছে অনেক গভীরে। তাই ইতিহাসের পাতায় এর খোঁজ করা যেতেই পারে কিন্তু সেখানেও রয়েছে অনেক লোককথার মিশেল।

নানা ধরনের কাহিনির সূত্রে জানা যায়, পাল রাজত্বের সময়ও অস্তিত্ব ছিল কর্ণগড়ের। একাদশ-দ্বাদশ শতকের কবি সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর 'রামচরিতম্' কাব্যে অনেক কিছুর সঙ্গে উল্লেখ করেছেন কর্ণগড় দুর্গের।

পাল আমলে যে কর্ণগড় ছিল, সে সম্পর্কের আরেক কাহিনি, জয়পালদেবের আমলে তাঁর সেনাপতি জ্ঞাতবর্মার সাহায্যে চেদিরাজ কর্ণদেব গৌড় আক্রমণ করে এই অঞ্চলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেন। অবশেষে বৌদ্ধপণ্ডিত ও ধর্মগুরু অতীশ দীপঙ্করের প্রচেষ্টায় অবসান হয় যুদ্ধের। দু'পক্ষের মধ্যে হয় সন্ধিও। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী চেদিরাজ কর্ণদেব জঙ্গলমহলের এই অঞ্চল দিয়ে যাতায়াত করেন বলে এর নাম কর্ণগড়।

ইতিহাসের ওই পথ ধরে এগোলেই কোনও এক বাঁকে শোনা যাবে অন্য কিছু কথা। চতুর্দশ শতকে নাকি বর্ধমান প্রদেশে দামোদরের তীরে ছিল একটি রাজ্য। রাজার নাম হেমাসিংহ। জাতে ক্ষত্রিয়। তাঁর ভাইয়ের নাম বীরসিংহ। মহাবলী তিনি। নিজের বাহুবল আর পরাক্রমে তিনি জয় করেছিলেন তাম্রলিপ্ত, বরদাভূমি ও কর্ণদুর্গও। আর এর থেকেই বোঝা যায়, এই ঘটনার আগে থেকেই কর্ণগড়ের অস্তিত্ব ছিল।

বীরসিংহের বংশে জন্মেছিলেন এমন চারজন রাজা যাঁরা শক্তি ও বীরত্বে ছিলেন তাঁরই যোগ্য উত্তরাধিকারী। এই চারজন হলেন অভয়া সিংহ, কুমার সিংহ, জামদার সিংহ ও সুরথ সিংহ। এঁরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় নির্মাণ করেন চার-চারটি দুর্গ। শালবনির সাতপাটি গ্রামের অদূরে 'অভয়গড়' নির্মাণ করেন অভয়াসিংহ। একই ভাবে গোদাপিয়াশালের কাছে 'কুমারগড়' নির্মাণ করেন কুমার সিংহ এবং 'জামদার' দুর্গ স্থাপয়িতা জামদার সিংহ। এই বংশের শেষ রাজা সুরথ সিংহ একই সঙ্গে কর্ণগড় ও বলরামপুরে রাজত্ব করেন।

রাজা সুরথ সিংহের দুই ঘনিষ্ঠ অনুচর লক্ষ্মণ সিংহ ও ভীম মহাপাত্র চক্রান্ত করে হত্যা করেন সুরথ সিংহকে। তারপর ভাগ করে নেন তাঁর রাজত্ব নিজেদের মধ্যে। এটা ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। লক্ষ্মণ সিংহ হন কর্ণগড়ের অধিপতি এবং বলরামপুরের রাজা হন ভীম মহাপাত্র।

'মেমোরান্ডা অব মিডনাপুর' গ্রন্থে এইচ. ভি. বেনি বলেছেন সুরথ সিংহ ছিলেন 'খয়রা জাতির' রাজা। আর কর্ণগড়ের নতুন রাজা লক্ষ্মণ সিংহ ছিলেন বঙ্গের উন্নত কৃষিজীবী সম্প্রদায় সদগোপ বংশোদ্ভব। লক্ষ্মণ সিংহই কর্ণগড়কে এক শক্তিশালী শক্তিতে পরিণত করেন একই সঙ্গে জঙ্গলমহলেরও প্রভূত উন্নতি ঘটান। তবুও তিনি নিহত হন ভাই শ্যাম সিংহের হাতে। রাজা হন শ্যাম সিংহ। ১৬৬১ থেকে সাত বছর রাজত্ব করেন তিনি।

দাদাকে হত্যা করে শ্যাম সিংহের সিংহাসন দখলকে মেনে নিতে পারেননি লক্ষ্মণ সিংহের ছেলে পুরুষোত্তম। সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন তিনি। একসময় আসে সুযোগ। শ্যাম সিংহকে সিংহাসন থেকে হটিয়ে তা দখল করেন পুরুষোত্তম সিংহ। তাঁর পর রাজা হন তাঁরই ছেলে সংগ্রাম সিংহ। সংগ্রামের পর তাঁর ছেলে ছটু রায়। ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দে ছটু রায়ের মৃত্যু হলে তাঁর ভাই রঘুনাথ রায় রাজ্যপাট সামলান। তাঁর পর কিছুদিনের রাজা হন ছটু রায়ের ছেলে বীর সিংহ। কিন্তু তাঁর সময়ে রাজ্যে দেখা দেয় চরম বিশৃঙ্খলা। শান্তি ফিরিয়ে আনতে বীর সিংহকে সরিয়ে রঘুনাথের ছেলে রাম সিংহকে সিংহাসনে বসান বঙ্গের সুবেদার দ্বিতীয় ইব্রাহিম খান ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে।

লক্ষ্মণ সিংহের পর এই রাম সিংহকে বলা যায় কর্ণগড়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সদগোপ রাজা। তিনি মেদিনীপুর শহরের উত্তরে তৈরি করেন 'আবাসগড়' নামে একটি দুর্গ। কর্ণগড় ও

আবাসগড়কে পরিখাবেষ্টিতও করেন। কেশপুরের কাছে 'রাম সরোবর' খনন করান তিনিই। তবে তাঁর সবচেয়ে বড়ো অবদান সম্ভবত 'শিবায়ন'-এর কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যকে আশ্রয়দান।

রাম সিংহের পর সিংহাসনে বসেন তাঁরই ছেলে যশোবন্ত সিংহ (১৭১১-১৭৪৯ খ্রিঃ)। তিনিই ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। রাজ্যের সবরকম উন্নতির দিকে ছিল তাঁর নজর। প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন প্রজাদের পিতা। তাদের কল্যাণের জন্য তিনি সবসময় থাকতেন সচেষ্ট। কূটনীতিতেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত কুশলী। বঙ্গের নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কাছে রাজকাজ শিখেছিলেন তিনি কিছুদিন। নবাব সুজাউদ্দিনের ছেলে সরফরাজ খাঁরও দেওয়ান ছিলেন তিনি কিছুদিন। আর এইসব অভিজ্ঞতাই তাঁকে কর্ণগড়ের শ্রেষ্ঠ রাজার তকমা এনে দেয়।

ব্যক্তিগত জীবনে যশোবন্ত সিংহ ছিলেন ধার্মিক। তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধপুরুষ। শোনা যায়, তিনি বাঁদর, শেয়াল, প্যাঁচা, বাদুর ও কুমির বা বাঘের পঞ্চমুণ্ডি আসনে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। রাজার সভাসদ রামেশ্বর ভট্টাচার্যর কথায়—
"... যশোবন্ত সিংহ সর্ব গুণবন্ত, শ্রীযুত অজিত সিংহ তাত।
মেদিনীপুরাধিপতি, কর্ণগড়ে অবস্থিতি, ভগবতী যাঁহার সাক্ষাৎ।।"

সাদর আহ্বান—আয়

যশোবন্ত পুত্র অজিত সিংহের হাত ধরে কর্ণগড় দুর্গে ঢোকার মুহূর্তে অতীত ইতিহাসে যেন ডুবে যায় শিরোমণি। দাঁড়িয়ে থাকে বিমূঢ় বিস্ময়। এতদিন কর্ণগড় সম্পর্কে যতকথা শুনেছে, আজ নিজেও সেই ইতিহাসেরই একজন হয়ে যাচ্ছে ভেবেই শিরোমণি শিহরিত, স্তব্ধগতি। তার ওই থমকে যাওয়াটা, অজিত সিংহ যেন কিছুটা উপভোগই করেন। তাই নববধূর পাশে তিনিও স্থির। তাঁদের দুজনের ওই হত-গতি অবস্থা দেখে সকলেই দাঁড়িয়ে থাকে ছবির মতো। কেবল বাদ্যকররাই বাজিয়ে চলেছে সুর তুলছে নানা।

ওদিকে বরণডালা সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানি ভবানী। দাঁড়িয়ে আছে রানির সহচরী দাসী এবং অন্যান্যরাও নানা বহুমূল্য উপচার হাতে নিয়ে। ওই ভাবেই কেটে যায় বেশ কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর শোনা যায় রানি ভবানীর কণ্ঠস্বর, কী হলো, সকলে দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? এগিয়ে এসো। প্রবেশ করো গড়ে।

রানির কথায় চেতনা আসে সকলের। সচল হয় তারা। রাজা অজিত সিংহও মৃদুস্বরে আহ্বান জানান তাঁর বালিকাবধূকে। বলেন এসো।

যে ঘোরের মধ্যে এতক্ষণ ছিল শিরোমণি, তা কেটে গেছে রানি ভবানীর প্রথম আহ্বানেই। এখন স্বামী রাজা অজিত সিংহের কথায় লজ্জাজড়ানো পায়ে হয় গতিময়ী।

রানি ভবানীর নির্দেশে আবার থামে সকলেই। নব পরিণীত রাজা অজিত সিংহ এবং শিরোমণি উঠে দাঁড়ান বরণপীঠের ওপর। সানাই, শঙ্খ ও উলুধ্বনির মধ্যে ভবানী বরণ করে নিজেরই স্বামী অজিত সিংহ এবং তাঁর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী শিরোমণিকে। বরণডালার দীপালোকে রাজা এবং শিরোমণির মুখ উজ্জ্বল বুঝি-বা আনন্দ বিহ্বল। বরণডালার দীপের পেছনে থাকা রানি ভবানীর চোখ কি তখন বিপদের সজল মেঘের ধারায় চিকচিক করে উঠেছিল! সে চোখের দিকে নজর যে নেই কারও। রানি ভবানী নিজেকে সংযত রেখেই আহ্বান জানায় শিরোমণিকে নিজের ছোটোবোন হিসেবে। স্নেহভরা কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—আয়, ভেতরে আয়। তুমিও এসো।

কবি রামেশ্বরের কথা

আনন্দপুরের কৃষক কন্যা, অরণ্যবালিকা শিরোমণি রানি হয়ে এলো কর্ণগড়ে। রাতারাতি বদলে গেল তার জীবনের সবকিছু। একদিন যে, খোলা আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়াত, সে আজ বন্দি রাজকীয় আদব-কায়দা আর নানা সহবতের সোনার খাঁচায়। ডানা ঝাপটাতে পারে না—উড়তে পারে না আকাশে, তাতেই হাঁফিয়ে ওঠে। ভুলতে পারে না তার ফেলে আসা জীবনটাকে। ভুলতে পারে না তার সেই গ্রামের পরিবেশ—তার ছেলেবেলার সাথীদের—সেই মুক্ত জীবনকে।

একথা সত্য, শিরোমণি এখন রাজবধূ। কিন্তু মনে মনে এখনও সে সেই ছেড়ে আসা গ্রামেরই বালিকা। তাই সে কেমন মনমরা। কিছুই ভালো লাগে না তার।

শিরোমণির মনের অবস্থাটা আন্দাজ করতে পারে রানি ভবানী। বয়সে শিরোমণির চেয়ে অনেকটাই বড়ো। তাই সপত্নী নয়, বড়ো দিদি হয়েই বুকে টেনে নেয় তাকে ছোটো বোন হিসেবে। রানি ভবানীর বরাবরই মনে হয়ে শিরোমণি যেন তার বাপের বাড়িতে ফেলে আসা ছোটো বোনটি। তাই অসূয়া নয়, পরম আদরেই ভরিয়ে দিতে থাকে তাকে। শিরোমণিও আঁকড়ে ধরে তার এই নতুন পাওয়া দিদিকে পরম বিশ্বাসে—শর্তহীন নির্ভরতায়। প্রায় সারাটা সময়ই কাটায় তার সঙ্গে। চলে কত না গল্পগাছা।

গল্প শুনতে খুবই ভালোবাসে শিরোমণি। বিশেষ করে রাজবাড়ির পুরনো দিনের কথা। আর সেসব কাহিনি শোনাতে কোনো আলস্য নেই রানি ভবানীর। তার কাছ থেকেই শিরোমণি শোনে কর্ণগড় রাজবাড়ির নানা পুরনো কাহিনি।

সেদিন গড়ের ছাদে বসে গল্পে মেতেছিল দুজনে নিত্যদিনের মতোই। সেটা ছিল পূর্ণিমার এক সাঁঝবেলা। আকাশের পূর্ণশশী। তার আলোয় চারিদিকটা যেন রুপো চকচক। দূরে মহামায়ার মন্দিরে বেজে উঠল আরতির ঘণ্টা। চকিতে দুই রাজবধূই করাঞ্জলি বদ্ধ হয়ে প্রণাম জানায় দেবীকে।

থেমে যায় কথা। দু'জনেই নীরব প্রার্থনায় মুখর মনে মনে। মন্দির থেকে ভেসে আসা কাঁসর ঘন্টা আর ঢাকের বাজনায় আবিষ্ট তখন সকলে। এক সময় শেষ হয় আরতি। থামে বাজনা। তখনই স্ব-ভাবে আসে দুই রানি। শুরু হয় আবার। ভবানী হঠাৎ-ই জিজ্ঞেস করে, বলতো আজ কোন তিথি।

তিথি? একটু অবাক হয়েই বলে শিরোমণি। হঠাৎ তিথির কথা

কেন দিদি।

ভবানীর কথায় লাগে কৌতূহলের সুর। চোখ নাচিয়ে বলে, বল না আজ কোন তিথি?

একটু ভাবে শিরোমণি। তারপর মাথা নাড়িয়ে বলে, না মনে পড়ছে না।

তার গালটা একটু টিপে বলে, আজ হলো পূর্ণিমা। দেখছিস না, চারদিকে জোছনা লুটোপুটি খাচ্ছে।

শিরোমণি তড়িঘড়ি বলে, আমিও তাই ভাবছিলুম দিদি, মনটা এমন আনচান করছে কেন?

—আর ভেবে কাজ নেই। এ সময় তোর মন যে এমন করবে এতো জানা কথা। তবে যে আমি কথাটা বলছিলুম শোন সেটা।

উদগ্রীব শিরোমণি বলে, হ্যাঁ দিদি বলো তোমার কথাটা।

—কথা নয়রে, ঘটনা, আর সেটা আমাদের শ্বশুরঠাকুর আর রামেশ্বর ভট্টাচার্যকে নিয়ে। শুনেছিস তো রামেশ্বর ভট্টাচার্যের নাম।

—ওই যে, যিনি পুঁথি লেখেন, তিনিই তো! তেনার সাধনের পঞ্চমুণ্ডির আসনই তো রয়েছে মহামায়ার মন্দিরে, তাই না দিদি।

—ঠিক ধরেছিস। উনি ছিলেন শ্বশুরঠাকুরের সভাসদ, সাধনার সঙ্গী, সিদ্ধ সাধক আবার বেশ উঁচুদরের কবি। অনেক পুঁথি আছে ওঁর।

—উনি কি বরাবরই এই কর্ণগড়ের বাসিন্দে?

—নারে, ওঁর বাড়ি ছিল যদুপুরে। জমিদারের অত্যাচারে ভিটে ছাড়া হন ওঁরা।

—কেন, কী করেছিলেন ওরা যে এভাবে উৎখাত করা হলো?

—প্রজারা থাকবে রাজা বা জমিদারের পায়ের তলায়। যত অন্যায়ই করুক না কেন রাজা বা জমিদার, তার প্রতিবাদ করা যাবে না কোনোভাবেই। করলেই অত্যাচার। উৎখাত, এমনকী প্রাণও নিয়ে নিতে পারে। এক্ষেত্রে জান ও মান বাঁচাতেই প্রজাকে ছাড়তে হয় সাতপুরুষের ভিটেও।

বিষণ্ণ হয়ে শিরোমণি বলে, ভারি অন্যায় এটা।

—তা হলে হবেটা কী? এটাই যে চলে আসছে বরাবর।

—না-না, এটা কখনই হতে পারে না। আমি এমনটা হতে দেব না কখনই।

—বেশ, বেশ, তোর হাতে ক্ষমতা এলে তুই তাই করিস। এখন শোন রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কথাটা।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই বলো।

রানি ভবানী শোনাতে থাকে সেই ঘটনার কথা, শুনতে শুনতে শিরোমণির মুখটা রাগে লাল হয়ে ওঠে। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলতে থাকে, না—না, এ ভারি অন্যায়। রানি ভবানী একটু ধমকের সুরেই বলে শান্ত হ' তো। শোন সব কথা।

শান্ত হয় শিরোমণি। ভবানীও বলতে থাকে রামেশ্বরের দুর্ভাগ্যের কথা। রামেশ্বররা থাকতেন যদুপুরে। গ্রামটা ছিল বরদার জমিদার রাজা শোভা সিংহের জমিদারিতে।

এক দিনের কথা। রামেশ্বরের স্ত্রী সুমিত্রা স্নান করছিলেন গ্রামের পুকুরে। সেই সময় পুকুরের পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন ঘোড়সওয়ার শোভা সিংহ। সুমিত্রা ছিলেন খুবই সুন্দরী। তাঁকে দেখেই শোভা সিংহের মাথায় যেন বায়ু চড়ে। জোর করে সুমিত্রাকে তুলে নেয় ঘোড়ায়।

আত্মরক্ষার জন্য সুমিত্রা চেঁচামেচি করতে থাকায় কিছুটা বেগতিক দেখেই তাকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিয়ে পালায় শোভা সিংহ। মান বাঁচে সুমিত্রার।

ব্যাপারটা কিন্তু ওখানেই মেটে না। শোভা সিংহ চলে যাওয়ার পরই সরব হয় সমাজপতিরা। ফতোয়া দেয় সুমিত্রাকে আর ঘরে নিতে পারবে না রামেশ্বর। ত্যাগ করতে হবে তাকে। সমাজপতিদের এ বিধান মানতে নারাজ রামেশ্বর। বাবার ভিটে ছেড়ে গ্রামেরই এক প্রান্তে কুটির বেঁধে বাস করতে থাকেন তিনি।

রামেশ্বর কিন্তু শোভা সিংহকে ক্ষমা করতে পারেন না। তাঁর এই দুর্গতির জন্য তাকেই দায়ী করেন তিনি। আর সেই জন্যই তাঁকে শাস্তি দিতে শুরু করেন মারণ যজ্ঞ।

শোভা সিংহের স্ত্রী অজিতা সুন্দরী কথাটা জানতে পেরে স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য কেঁদে পড়েন রামেশ্বরের পায়ে। দয়া হয় তাঁর। বন্ধ করেন সেই মারণ যজ্ঞ। শোভা সিংহ কিন্তু ঘটনাটা জানতে পেরে স্ত্রী অজিতা সুন্দরীকেই ত্যাগ করেন।

এরপরই ঘটল আরেকটা ঘটনা। ১৬৯৫—৯৬-এ শোভা সিংহ বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায়কে মেরে তার মেয়ে সত্যবতীকে জোর করে ভোগ করতে যায়। তৈরি ছিল সত্যবতীও। হত্যা করে সে শোভা সিংহকে।

খবরটা কানে আসে রামেশ্বরেরও। একজন শত্রুনিধনের আনন্দে গান বেঁধে ফেলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। তিনি লেখেন—

'হেরি শোভা ভোগবতী বর্ধমানে গেল ছুটি
সত্যবতীর লুটিতে যৌবন।
ভগবতীর রোষানলে বক্ষবিদ্ধ হল শেলে
ধ্বংস হল কলির রাবণ।।'

লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে গানটা। একসময় তা কানে আসে শোভা সিংহের ভাই হেমৎ সিংহের। জ্বলে উঠল হেমৎ সিংহের চোখ। জ্বলে গেল রামেশ্বরের বাড়িঘর। গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো তাঁর সবকিছু। গ্রাম ছাড়া করা হলো তাঁকে।

এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের দুর্গতির কথা শুনছিল শিরোমণি। শোভা সিংয়ের ওই বর্বরতা, ওইরকম নির্মম শোষণের কথা শুনতে শুনতে শিরোমণি কখনও উত্তেজনায় হুংকার দেয়, আবার কখনও রামেশ্বরের দুঃখের কথায় চোখের জল মোছে। কান্না-ভেজা গলায় প্রশ্ন করে, তারপর?

রানি ভবানী বলে, তারপর আর কী। অসহায় রামেশ্বর সপরিবারে চলে আসেন তাঁর মামার বাড়ি কাপাসটিকরি গ্রামে। তাঁর সবকথা কানে এল আমাদের শ্বশুরঠাকুরের বাবা রাজা রাম সিংহের কানে। দয়ায় উথলে উঠল হৃদয়। তিনি তাঁকে অযোধ্যানগরে জমিজমা দিয়ে বাড়ি ঘর করে থাকার পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দেন। সেই সঙ্গে তাঁকে দেন পুরাণ পাঠকের কাজ।

কৃতজ্ঞতায় রামেশ্বর তাঁর নতুন কাব্য 'শিবায়ন'-এ লিখেছেন—

''পূর্ববাস যদুপুরে হেমৎ সিং ভাঙ্গে তারে—
রাজা রাম সিং কৈল প্রীত
স্থাপিয়া কৌশিকী তটে করিয়া পুরাণ পাঠে
রচাইল মধুর সঙ্গীত।''

১৭১১ সালে রাজা রাম সিংহের মৃত্যুর পর রাজ সিংহাসনে বসেন আমাদের শ্বশুরঠাকুর যশোবন্ত সিংহ। এরপর রামেশ্বর তাঁর 'শিবায়ন' কাব্য শেষ করে রাজসভায় পাঠ করেন। সে পাঠ শুনে রাজা-প্রজা সকলেই খুব খুশি। জয়, জয়ধ্বনি ওঠে চারিদিকে।

জানিস তো, আমাদের এই কর্ণগড়ে যে দণ্ডেশ্বর শিবমন্দির রয়েছে, তারই দক্ষিণদিকে বসে রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর ওই 'ভবভাব্য ভদ্রকাব্য' 'শিবায়ন' কাব্য লেখা শেষ করেন।

অত্যাচারী জমিদারের হাতে কবি রামেশ্বরের নির্যাতিত হওয়া, পিতৃভিটে ছেড়ে এই কর্ণগড়ে আশ্রয় পাওয়ার কাহিনি শিরোমণির মনকে দারুণভাবে নাড়া দেয়। অহরহ মনে হয় ওই একই কথা—কেন মানুষ মানুষকে দেয় এমন কষ্ট। কী লাভ হয় তাতে। শেষ পর্যন্ত তো কোনো না কোনো ভাবে শাস্তিই তো পেতে হয়। তাহলে কীসের জন্য এসব কথা।

শিরোমণি মনে মনে এইসব প্রশ্ন তুলে কেমন যেন উদাস হয়ে যায়। ঠিক করে, সুযোগ পেলে সে এর প্রতিকার করবেই করবে।

প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হয় শিরোমণি। আর তখনই মনেপড়ে সেই পূর্ণিমার কথা, যার থেকে শোনা হলো এত কথা। সেটা মনে পড়তেই শিরোমণি বলে, দিদি আসল কথাটাই যে শোনা হলো না।

—কোন আসল কথা?

—ওই যে, পূর্ণিমের কথা বলছিলে—কী হয়েছিল পূর্ণিমাতে?

—হ্যাঁ সেটাই এবার বলছি। এটা অবশ্য আমারও শোনা কথা। যখন এসব হয়েছিল, তখন আমি কোথায়? তা আমি যেমন শুনেছি তেমনই বলছি, শোন।

আমাদের শ্বশুর ঠাকুরের সঙ্গে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের ছিল বন্ধুর সম্পর্ক। সময় পেলেই দুজনে মেতে যেতেন নানা কথায়। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যেত সে খেয়ালই থাকত না কারও। শেষে শাশুড়ি ঠাকরুনই লোক দিয়ে খবর পাঠাতেন, তাতেই নাকি ফিরত হুঁশ!

যাই হোক সেদিনের কথা। আমাদের শ্বশুরঠাকুর হঠাৎ-ই জিজ্ঞেস করলেন আজ কোন তিথি?

রামেশ্বর ভট্টাচার্য তখন কী যেন কী একটা ভাবছিলেন। তাই সব কিছু ভালো করে না শুনেই বলেন, 'আজ পূর্ণিমা'?

পূর্ণিমা! খটকা লাগে আমাদের শ্বশুরঠাকুর রাজা যশোবন্তের মনে। একটু কিন্তু কিন্তু করেই তিনি বলেন, কয়েক রাত থেকেই যেন একটু অন্ধকার ঠেকছে চারিদিক।

ততক্ষণে হুঁশ ফিরেছে রামেশ্বর ভট্টাচার্যেরও। 'তাই তো, একী বললাম, আজ তো পূর্ণিমা নয়, তাহলে এত বড়ো ভুলটা করলাম কী করে। এখন অন্য কথা বললে তো রাজার মনে সন্দেহ জাগবে! হে মহাদেব, হে মহামায়া, পথ দেখাও।'

এসবই মুহূর্তের ভাবনা। রামেশ্বর ভাবেন, মা যখন একথা তাঁর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁর মনে কিছু একটা আছে। হয়তো আজ প্রকাশ পাবে মা মহামায়ার কোনো লীলা।

'জয় মা' ধ্বনি দিয়ে রামেশ্বর আবারও বলেন, হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আজ পূর্ণিমা—পূর্ণিমা-ই।

মুখে একথা বললেও, রামেশ্বর কেমন যেন আনমনা। রাজা যশোবন্তও তাই। দুজনেরই সব কথা হঠাৎ-ই যেন ফুরিয়ে যায়। আসরের ঘটে অকাল সমাপ্তি। যশোবন্ত ফিরে যান প্রাসাদে আর রামেশ্বর যান মহামায়ার মন্দিরে।

মায়ের মূর্তির কাছে আকুল কান্না রামেশ্বরের। এ কী বলে ফেললাম। নাকি তুমিই বলিয়েছো—মান রাখো মা।

মহামায়া দিলেন প্রত্যাদেশ, আজ রাতে রাজাকে নিয়ে মন্দিরে আয়। তখনই জানবি আজ কোন তিথি!

নিশ্চিন্ত হয়েই ঘরে ফেরেন রামেশ্বর। অপেক্ষা করেন সন্ধ্যার। রাত নামতেই রাজাকে নিয়ে আসেন মন্দিরে। প্রণাম করেন দেবীকে। তারপরই ঘটে এক অলৌকিক ঘটনা।

তাঁরা দেখলেন মহামায়া তাঁর বাঁ হাতটা তুললেন বরাভয়ের ভঙ্গিতে। তাঁর হাতের বালা থেকে যেন ঠিকরে পড়ছে হাজার চাঁদের আলো।

দেখতে দেখতে রাজা যশোবন্ত বিভোর হয়ে যান। তাঁর অন্তরলোক দেখে চারিদিক ভরে গেছে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয়-আলোয়।

কেটে যায় অনেক মুহূর্ত। সেই দেবী মন্দিরেই রাজা এবার লুটিয়ে পড়েন রামেশ্বরের পায়ে। আর রামেশ্বর তখন বাহ্যজ্ঞান রহিত। মা মহামায়ার লীলায় বিভোর তিনি বারবার প্রণাম জানান মা মহামায়াকেই।

ভবানীর মুখে এই কাহিনি শুনে শিরোমণিও চলে যায় কোনো এক নাম না জানা দেশে। সেইসঙ্গে প্রণাম জানাতে থাকে মা মহামায়াকেই। বারবার বলতে থাকে মনে মনে অনেকটা মন্ত্রের মতোই, —মা আমাকে শক্তি দাও। তুমি তো জাগ্রত মা—তুমি রক্ষা করো আমাদের পরিবারকে—কর্ণগড়ের প্রতিটি মানুষকে। সেইসঙ্গে দাও শুভবুদ্ধি, মানুষে মানুষে হানাহানি বন্ধ হোক। সকলে যেন শান্তিতে থাকে। আমিও যেন সকলকে রক্ষা করতে পারি। তুমি সবসময় আমার সঙ্গে থেকো মা। কৃপা করো।

শিরোমণির ওই বিভোর ভাব দেখে এক ঠেলা দিয়ে বলে ভবানী, কীরে, কী হলো? অমন থম মেরে গেলি কেন?

—এমনি-ই।

—এমনিই!

—হ্যাঁ দিদি, আমি ভাবছি অন্য একটা কথা।

—কী?

—দেবী সবসময়ই আমাদের রক্ষা করেন, তাই না?

ভবানী দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম জানান দেবীর উদ্দেশে।

তারপর বলেন, শুনবি দেবীর করুণার কথা?

সেদিন গল্প বলা আর শোনায় পেয়েছিল ভবানী ও শিরোমণিকে। গল্পের প্যাটরা উজাড় করে ভবানী আর নিবিষ্টভাবে শোনে শিরোমণি। ভবানী বলে, তবে শোন, মায়ের কৃপার কথা।

সেবার শ্বশুরঠাকুর যশোবন্ত সিংহ মন্দিরে পঞ্চমুণ্ডির আসনে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। এমনসময় বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহ তাঁদের কুলদেবতা মদনমোহনকে সঙ্গে নিয়ে অতর্কিতে কর্ণগড় আক্রমণ করেন। সেই মুহূর্তে ধ্যানমগ্ন রাজার কাছ থেকে কোনো নির্দেশ না পেয়ে কর্ণগড়ের সেনারা পালিয়ে যায়। হই হই করে বিষ্ণুপুরের বাহিনী গড়ে ঢুকে পড়ায় শুরু হয় দারুণ কোলাহল। তাতেই ধ্যান ভাঙে যশোবন্তর। অবস্থা বুঝে নিরুপায় রাজা দেবী মহামায়ারই শরণ নেন। আকুল হয়ে ডাকতে থাকে তাঁকে।

তারপরই অবাক কাণ্ড। একটি ঘোড়ায় চেপে দেবী মহামায়া ঘোর রণে শত্রুসৈন্য ধ্বংস করতে থাকেন। তখন এগিয়ে আসেন মদনমোহন কিন্তু পরাজিত হয়ে মদনমোহন ফিরে যান বিষ্ণুপুরে। রক্ষা পায় কর্ণগড়।

জানিস তো, এই কাহিনি রামেশ্বর ভট্টাচার্যই তার একটা ছোটো পুঁথিতে লিখেছেন—

''মহামায়া মদনমোহনের ঠেলাঠেলি
দ্বিজ রামেশ্বর ভনে কলিকালে কেলি।''

এই সব কাহিনি বলতে আর শুনতে কেটে যায় অনেকটা সময়। দুই রানি ভবানী আর শিরোমণি ধীরে ধীরে নেমে আসে নীচে। প্রতীক্ষা করতে থাকে তারা আরেকটি নতুন দিনের জন্য।

বয়ে চলে পারাং

পারাং নদী দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল। জঙ্গলমহলে শাল-সেগুনের পাতা ঝরা আর নতুন পাতা গজানোর চাকাটা ঘুরেছে অনেকবার। বদলের রং লেগেছে অনেক কিছুতেই। কর্ণগড়ের রাজবধূ শিরোমণির দেহে এখন ভরাবর্ষার ভার। চঞ্চলা শিরোমণি এখন অনেক ধীর স্থির।

অজিত সিংহ ক্রমে হয়ে উঠেছেন জঙ্গল মহলের সবচেয়ে পরাক্রমশালী রাজা। প্রথমেই সুসংহত করেন তিনি তার সেনাবাহিনীকে। বাহিনীতে ছিল পনেরো হাজারেরও বেশি সেনা। বস্তুত সেই সেনার দাপটেই তিনি দাবিয়ে রাখেন জঙ্গলমহলের ছোটোবড়ো আর সব রাজাকে। তাঁর প্রতাপের কথা জানা যায় কোম্পানির সরকারের ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দের এক চিঠি থেকে জানা যায়, ছোটোবড়ো মিলিয়ে তিনি নাকি একুশটি জমিদারির ওপর আধিপত্য করতেন।

রাজার সব আছে, নেই কেবল সন্তান। বড়ো রানির সন্তান না হওয়ায় একরকম তাঁর কথাতেই বিয়ে করেছিলেন শিরোমণিকে। অবশ্য কেবলই যে রানি ভবানীর কথায় অথবা সন্তান কামনায় তিনি শিরোমণিকে বিয়ে করেছিলেন তা অবশ্য নয়। বিয়ে করেছিলেন, তাকে প্রথম দেখাতেই ভালো লেগেছিল বলে। মজেছিলেন শিরোমণির রূপে, তার সদা চাঞ্চল্যে। সেই সঙ্গে বংশরক্ষার একটা সুপ্ত বাসনা যে ছিল না, তা নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, শিরোমণিও ফলবতী হলো না।

অনেকে অনেক কথা বললেও, রাজা অজিত সিংহ অবশ্য কোনো দিনই সন্তানহীনতার জন্য রানিদের দায়ী করেননি। বরং বহুবার তাঁর মনে হয়েছে, তাঁর কারণেই রানিরা হয়তো মা হতে পারেননি। আর সে কারণেই সবটাই তিনি মহামায়ার ইচ্ছা বলেই মেনে দিয়েছিলেন। ভাগ্য এবং ঈশ্বর-নির্ভরতার কারণেই তিনি তাঁর অস্থির চিত্ত স্থির করেছেন শক্ত হাতে লাগাম টেনে।

রাজার মতোই সন্তান না হওয়ার জন্য নানা মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে রাজার দুই রানিই। বিশেষ করে ভবানী। প্রায়ই মনে হয়, তার অক্ষমতার কারণে রাজার সন্তান হয়নি। কিন্তু শিরোমণির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটল কেন? কোনো দিক থেকেই শিরোমণি তো অসম্পূর্ণা নয়। তাহলে—?

এই 'তাহলে'-টাই নিরুচ্চার ভাবে পাক খায় কর্ণগড়ের কোণায় কোণায়। শিরোমণির অবশ্য এ ব্যাপারে তেমন হেলদোল নেই। মা না-হবার যন্ত্রণা তাকেও ক্ষতবিক্ষত করে। কিন্তু প্রকাশ করে না তীক্ষ্ণ শরে প্রতিনিয়ত বিদ্ধ হওয়া তার হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণের কথা। নিজের যন্ত্রণার কথা, নিজের সন্তান না হলেও শিরোমণি খুশি রাজ্যের প্রজাদের নিয়ে। অল্পদিনের মধ্যে শিরোমণি হয়ে ওঠে প্রজাদের ছোটো রানিমা বা কেবলই মা জননী।

শিরোমণির কিশোরীবেলার সেই চঞ্চলতা কমেছে একথা ঠিক। তা বলে সে যে ঘরে বসে থাকত তাও নয়। শিরোমণি প্রায়ই বেরিয়ে পড়ত রাজপ্রাসাদ থেকে। কোনোরকম রক্ষী না নিয়েই। সটান চলে যেত রাজ্যের বিশেষ করে গরিবগুর্বো প্রজাদের ঘরে। দাওয়ায় বসে শুনতো তাদের দুঃখকষ্ট, অভাব অভিযোগের কথা। যেগুলোর প্রতিকার তার আয়ত্তের মধ্যে থাকত সেগুলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে করত সে। আর যেগুলো তার ক্ষমতার বাইরে তার জন্য এক ধরনের আবদার করত স্বামী রাজা অজিত সিংহের কাছে।

রাজা সত্যিই ভালোবাসতেন শিরোমণিকে। কেবল স্ত্রী অথবা সুন্দরী নারী হিসেবে নায়, রাজার প্রেমে কেমন যেন একটা স্নেহের মাখামাখি ছিল। হয়তো-বা ছিল এক ধরনের অপত্যস্নেহও। সন্তান থাকলে তার আবদার মেটানোর জন্য যা যা করতেন, সেগুলোই তিনি করেন রানি শিরোমণির ক্ষেত্রে। এর যে বাঁকা অর্থ কেউ করে না, তা নয়। কিন্তু সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না রাজা অজিত সিংহের।

আর রানি শিরোমণি। পতি অজিত সিংহের মাঝেমাঝেই এই পিতা হওয়াটা তার কাছে ছিল রীতিমতো ভালো লাগার বিষয়। ওইসময় তার বারবার মনে পড়ত আনন্দপুরের কথা। মনে পড়তো বাবার কথা। সাধ্য না থাকলেও বাবা তার সবসময়ই ব্যস্ত থাকত মেয়ের সাধ পূরণের জন্য। বাবার মুখের সেই ছায়া সে দেখতো স্বামী অজিত সিংহের তৃপ্ত মুখে। সেটা দেখতে দেখতে

শিরোমণি হারিয়ে যেতো তার ছেড়ে আসা গ্রাম—তার বাবা মা—খেলার সাথী—সেখানকার সব আপন হওয়া সব মানুষজন আর সেখানকার প্রকৃতি পরিবেশের মধ্যে।

তার সেই আনমনা ভাব দেখে রাজার বেশ ভালোই লাগতো। অনেকক্ষণ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতেন তিনি ওই ভালো লাগাটাকে। তারপর আলতো ঠেলায়, জিজ্ঞেস করতেন, কী হলো? কোথায় হারিয়ে গেল আমার ছোট্ট বউটা।

লজ্জা পেতো শিরোমণি। মেনি বেড়ালের মতো এক ধরনের আদুরে গলায় বলতো, হারাবো কোথায়? এই তো আমি রয়েছি তোমারই কাছে।

—তাই! কিন্তু মনটা কোথায় গেল?

উত্তরে ভারী হতো শিরোমণির গলা। বলতো, হঠাৎ-ই আনন্দপুরের কথা মনে পড়ে গেল। বাবা-মা, সেখানকার মানুষ—সকলে যেন আমার চোখের সামনে এসে পড়লো। তাই—

পতি আবার পিতা। অথবা সখা। নরম গলায় বলেন অজিত সিংহ, কী যাবে সেখানে? ব্যবস্থা করবো সব?

ঘনঘন মাথা নাড়ে শিরোমণি। না, না, সেখানে যাওয়ার কী আছে। তাছাড়া ওখানে যাওয়াটা বেশ হ্যাপার ব্যাপার।

—বেশ তো, তাহলে ওদেরই বরং আসতে বলি। তাতে তোমার ওই 'হ্যাপাও' থাকবে না, আর দেখাটাও বেশ হয়ে যাবে।

একথার আর না করে না শিরোমণি। বলে, সত্যি সত্যি তুমি আমার বাবা-মাকে এখানে নিয়ে আসবে?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ! আমার বউয়ের মন যখন খারাপ, তখন ও কাজটা তো আমাকে করতেই হবে। না হলে হয়তো, রাগ করবেন রানি, আর এক হুকুমে আমার গর্দানটাই কেটে নেবে।

শিরোমণি স্বামীর বুকে মাথা রেখে শুধু বলে, যাও।

রাজপ্রাসাদের সকলের সঙ্গেই বেশ ভালো ভাব রানি শিরোমণির। প্রজাদের ঘরেও তার নিত্য যাতায়াত। তবুও, মনের কথা বলার মতো মানুষ তার বড়োই কম। তাই সকলের মধ্যে থেকেও শিরোমণির মাঝে মাঝে নিজেকে বড়ই একা লাগে।

স্বামী সোহাগিনী সে। একথাটা নিজেও জানে শিরোমণি। কিন্তু স্বামীকে তো আর সবসময় কাছে পাওয়া যায় না। সব সময় বলাও যায় না সব কথা। স্বামী তার রাজা। কত কাজ তার। নিজের রাজ্য রক্ষা করা, শত্রুদের থাবা যাতে রাজ্যে না পড়ে তার জন্য সব ব্যবস্থা করা, সজাগ থাকা, রাজ্যের সীমানা যাতে এক জায়গাতেই আটকে না থাকে, তারজন্য নতুন নতুন জায়গা দখল করা। সেই



শারদীয়া দুর্গোৎসব ও দীপাবলির প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন



Seva mudran

A HOUSE OF WEB & SHEET FED OFFSET PRINTING

OFFSET PRINTING (B/W & MULTI COLOUR), DTP & PERFECT BINDING

ALL UNDER ONE ROOF

We specialise in :

Bulk Offset Printing • Government & Institutional Printing • DTP Composition • Perfect Binding • Four Colour Offset Printing • Publishing

43, Kailash Bose Street, Kolkata - 700 006

Phone: 033-2350-5468 / 2350-0058 • **Mob**: 9836013270

E-mail: sevamudran@gmail.com

URL: www.sevamudran.com

GeM Registered | MSME/Udyam Registered

সঙ্গে প্রাসাদে কেউ যাতে গুপ্ত চক্রান্ত না করতে পারে সে দিকেও সতর্ক দৃষ্টি দিতে হয় রাজাকে। তাই সব মিলিয়ে রাজার নিজের কাজে সময় বড়োই কম। আর রাজা তো একা তার নয়, ভবানীও তো আছে। তাকেও তো সময় দিতে হয়। সে কারণে স্বামী তার সব সময় সব কথা বলার মানুষ নয় কখনই।

সেদিক থেকে প্রাসাদের তার সত্যিকার আপনজন বলতে বড়োরানি ভবানী। লোকে বলে সতীন কাঁটা। কিন্তু তারা যদি এই কর্ণগড় রাজপ্রাসাদে আসে তাহলে বুঝবে কথাটা সবসময় সত্যি নয় কখনই। প্রথম দিন থেকেই ভবানী নিয়েছে শিরোমণির দিদির আসন। আর শিরোমণিও ছোটো বোনটি হয়ে আছে বেশ আনন্দেই। ওপরের ঝড়ঝাপটা সবই সামলান দিদি—ভবানী।

এই দিদির সঙ্গে সব সুখ-দুঃখের কথা ভাগ করে নেয় শিরোমণি। মনের ইচ্ছে অনিচ্ছে সব কথা সে অকপটে জানাতে পারে ভবানীকে। আবদার যা করার তাও করে সে তার এই দিদির কাছেই। রানি হলেও তাদের দুজনের দুঃখই যে একরকম। বাইরে যত সম্পদ, আলো-হাসি-গান থাকুক, তাদের দুজনের হৃদয়ই একধরনের অন্ধকারে ডুবে রয়েছে, তার যাতনা যে কী ভয়ানক, সে কথা তারা বোঝাবে কাকে? তাই তারা দুজনেই এক্ষেত্রে দুজনের একমাত্র অবলম্বন।

এই দুজন ছাড়া আর যার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পায় সে হলো তার চুনিদা। রাজবাড়ির দেওয়ান চুনিলাল খান। নাড়াজোল রাজবাড়ির সন্তান। কর্ণগড়ের রাজাদের সঙ্গেও তার একটা সম্পর্ক ছিল। একইভাবে চুনিলাল ছিল শিরোমণির বাবা বৈদ্যনাথের তুতো দাদার ছেলে। সেই সূত্রেই আনন্দপুরে ছিল তার নিত্য যাতায়াত। শিরোমণি সেই শিশু বয়সে আধো আধো সুরে ডাকত তাকে—চুনি দা– চুনিদা বলে। তখন থেকেই তার যত আবদার চুনিদার কাছে।

আর চুনিলালও কেমন একটা মায়ায় জড়িয়ে গিয়েছিল শিরোমণির সঙ্গে। তার টানেই সে ঘন ঘন চলে আসতো আনন্দপুরে। মাঝে কাজের চাপে কিছুদিন সে আনন্দপুরে আসতে পারেনি। এমন কী শিরোমণির বিয়েতেও। তার জন্য শিরোমণির ছিল ভারি অভিমান।

বিয়ের কিছুদিন পর সেই চুনিলালকে শ্বশুর বাড়িতে দেখে শিরোমণি ভারি খুশি। সব অভিমান জল। তারপর যখন শুনল চুনিলাল তাদের রাজবাড়ির নতুন দেওয়ান, তখন আর তাকে পায় কে! আবার সেই বালিকাবেলার মতোই চুনিলালের সঙ্গে গল্পগুজব করা। মাঝে মাঝে আবদার করত। মোটকথা, জমিদারির কাজের বাইরে শিরোমণির সঙ্গে গল্প করাটাও হলো চুনিলালের আরেকটি বড়ো কাজ।

চুনিলাল আর শিরোমণির এই মেলামেশা নিয়ে রাজবাড়িতে কোনো সমস্যা ছিল না। রাজা অজিত সিংহেরও ওই দুই ভাই-বোনের ভাব, খুনসুটি দেখে ভারি মজাই লাগত। তাই কোনো মন্দ চিন্তা ছুঁতে পারেনি রাজাকে।

শুরু চক্রান্ত

একজন কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে মনে মনে শকুনির মতোই ঘুঁটি সাজাতে থাকে। লোকটি কর্ণগড়েরই এক রাজ কর্মচারী। রাজ সেরেস্তায় বেশ বড়ো পদেই কাজ করে সে। কিন্তু সে পদে সন্তুষ্ট নয় সে। অনেক দিন থেকেই রাজবাড়ির দেওয়ানের গদির দিকে নজর ছিল তার। কিন্তু কিছুতেই পৌঁছাতে পারছিল না সে লক্ষ্যে। তবে হাল ছাড়েনি কোনোদিন।

লোকটির নাম যুগলচরণ। চুনিলালের আগের দেওয়ান চলে যাওয়ার পর যুগলচরণ ছিল ওই পদের দাবিদার। তাঁর নিয়োগও ছিল প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু শেষমুহূর্তে রাজা তাদের আত্মীয় চুনিলালকে দেওয়ান করার পর থেকেই যুগলচরণ যেন বিষধর সাপ। ছোবল মারার জন্য মুখিয়ে থাকে।

রাজা অজিত সিংহের ওপরই ছিল যুগলচরণের সবচেয়ে বেশি রাগ। কিন্তু রাজার ওপরে রাগের কারণে কিছু করে বসলে তার যে ফল ভালো হবে না, তা বেশ ভালোই জানতো। তাই লক্ষ্য বদলায় সে। রাজা নয়, তার যত রাগ এখন চুনিলালের ওপরে। তাকে পদ থেকে সরানোর জন্য একটার পর একটা চক্রান্তের জাল বিছোতে থাকে।

চুনিলালের ওপর রাজা এবং তাঁর পরিবারও যেভাবে নির্ভর করছে, তাতে তাকে সরানো যে খুব একটা সহজ হবে না এটা বেশ ভালোই বোঝে যুগলচরণ। তাই আবোল তাবোল অনেক কিছুই ভাবে কিন্তু কোনো পথ খুঁজে পায় না। একসময় চুনিলালকে হত্যা করার কথাও ভেবেছিল। কিন্তু ঝুঁকির কথা মনে রেখেই সে চিন্তা ছাড়ে সে। খোঁজে অন্য কোনো পথ।

সেই পথ খুঁজতে গিয়ে যুগলচরণ একটা কদর্য খেলায় নামে। রানি শিরোমণি আর চুনিলালের সম্পর্কে ফিসফাস করে সে। একে একে অনেককেই সে দলে টানে। তখনই লাগে রাজা অজিত সিংহের কান ভাঙাতে। কানে ঢালতে থাকে নানা সন্দেহের বিষ। অবশেষে সফলও হয় যুগলচরণ।

এমনিতেই রাজারা কান দিয়েই দেখেন। আর সেটা স্ত্রীর সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক নিয়ে হলে তো একসময় অতি বড়ো প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও ভুল করেন। সেই সুযোগ নিয়ে চুনিলাল সম্পর্কে আরও নানা অভিযোগ তুলে রাজাকে বিরূপ করে তোলে। তারই জেরে রাজা বরখাস্ত করেন চুনিলালকে। তার ফলে শিরোমণির জীবনের একটি খোলা জানলা বন্ধ হয়ে যায়।

চুক্তি তিন শর্তে

তবু মিটল না সাধ। পুরণ হলো না আশাও। কর্ণগড়রাজা অজিত সিংহ মারা গেলেন নিঃসন্তান অবস্থায় ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে। ভাগ হয়ে গেল অজিত সিংহের রাজ্য বা জমিদারি। দুই ভাগের অধিকারী হয় ভবানী আর শিরোমণি। রাজা নয় এবার শুরু হলো মেদিনীপুরের রানি-জমানা।

অজিত সিংহের মৃত্যুর প্রায় পরে পরেই ঘটে এমন একটি ঘটনা, যাতে বদলে যায় কর্ণগড়ের ইতিহাসের গতিপথ। ইংরেজ

ঐতিহাসিকদের বিকৃত রচনায় 'চুয়াড় বিদ্রোহ' নামে আখ্যাত কৃষক ও সাধারণ নিম্নবর্গীয় অধিকার হারা মানুষের যে বিপ্লব সূচিত হয়েছিল জঙ্গল মহলে, তারই একটি আঘাত এসে পড়ে কর্ণগড়েও। সম্ভবত, জমিদারি বা রাজ্যের অধিকারী মহিলা ভেবে ওই কৃষক বিদ্রোহীদেরই একটি অংশ আক্রমণ করে কর্ণগড়। ওই আক্রমণকারীদের নেতা ছিল গোবর্ধন দিকপতি নামে এক বাগদি সর্দার।

সেই আক্রমণের মুখে অপ্রস্তুত দুই রানিই আত্মরক্ষার তাগিদেই নাড়াজোলের জমিদার ত্রিলোচন খাঁয়ের কাছে আশ্রয় নেয়। দুই রানি কর্ণগড় ছেড়ে ত্রিলোচন খাঁয়ের সঙ্গে যেখানে দেখা করে, সে জায়গর নাম 'রানি পাটনা'। সেখানে দুই রানির সঙ্গে একটি চুক্তি হয় ত্রিলোচনের। ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে ওই চুক্তিপত্র বা 'অছিয়তন একরার'-এ ছিল মূলত তিনটি শর্ত। সেগুলি হলো—

ত্রিলোচন খান চুয়াড়দের বিদ্রোহ দমন করবেন।

রানিদের জীবদ্দশায় ত্রিলোচনই কাজ করবেন নায়েব হিসেবে।

রানিদের মৃত্যুর পর ত্রিলোচন অথবা তাঁর উত্তরাধিকারী হবেন কর্ণগড় তথা মেদিনীপুর রাজ্যের অধিপতি।

এই অঙ্গীকারপত্র সম্পাদনের মধ্য দিয়ে কর্ণগড় ও নাড়াজোলের সম্পর্ক আরও দৃঢ়বদ্ধ হয়। দুই রানিই কর্ণগড় ছেড়ে আশ্রয় নেয় নাড়াজোলে।

ত্রিলোচন কথা রেখেছিলেন। গোবর্ধন দিক্‌পতির হাত থেকে উদ্ধার করেন কর্ণগড়সহ মেদিনীপুরের জমিদারি এবং তিনিই হন এক অর্থে জমিদারির সর্বেসর্বা, যদিও সাধারণ হিসেবে তিনি ছিলেন রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক।

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে কর্ণগড়ের বড়োরানি ভবানীর মৃত্যু হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার নানা রকমের আইনের প্যাঁচে রানি ভবাণীর জমিদারিটুকু প্রায় জবরদখল করে। শিরোমণি অবশ্য তার অংশের মালিক থাকেন যথারীতি। আর ত্রিলোচন যথারীতি দেওয়ান হিসেবে জমিদারি সামলাতে থাকেন।

শিরোমণি ততদিনে অনেকটাই বদলে গেছে। শিরোমণি নিজেকে বদলে নিয়েছে। এবং সেটা অবস্থা আর পরিস্থিতির চাপে। অথচ এটা সে চায়নি কখনই। রানি হয়ে কর্ণগড়ে এলেও মনের দিক থেকে সে কোনোদিনই রানি হিসেবে এই জমিদারির ভার নিতে চায়নি। বারবারই তার মনে হয়েছে, রানির রাজদণ্ড হাতে নিলে সে হয়তো মাটির ছোঁয়াটা হারিয়ে ফেলবে। আর সেই ভয়টাতেই ক্ষমতা থেকে দূরে থাকতে চেয়েছে।

সেই ছোটোবেলা থেকেই শিরোমণি শিকড়-মুখী। সাধারণ কৃষক ঘরের কন্যা কর্ণগড়ের রানি হয়েও হয়নি আকাশ-বিলাসী। ভোলেনি তার পিতৃকুলের অবস্থার কথা। ভোলেনি তার গ্রামের মানুষজনের কথা। তাই বা কেন, ভোলেনি সে তার গ্রামের মতোই আর সব মানুষের কথা। ভোলেনি বলেই রাজরানি হয়েও সাধারণ প্রজাদের ভালোর জন্য যা যা করা উচিত, সেটাই করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। কিন্তু গোবর্ধন দিকপতি কর্ণগড় দখল করার পর তার বিশ্বাসের ভিতটা একটু হলেও নড়ে গিয়েছিল।

শিরোমণি নাড়াজোলে যাওয়ার পর ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছু ভালো করে দেখেছে। পরে মনে হয়েছে সব-হারানো রায়ত-পাইকদের কাছে সব জমিদার রাজাই শোষক। সেই শ্রেণীবিদ্বেষের কারণেই হয়তো তারা ওই আক্রমণ চালিয়েছিল। তাছাড়া হয়তো আরও একটা কারণ ছিল।

হ্যাঁ, অনেক কিছু ভাবার পর এটাও মনে হয়েছিল শিরোমণির। ওই বিদ্রোহী চাষি-পাইকদের দরকার অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্রের। হয়তো তাদের মনে হয়েছিল রাজা অজিত সিংহের অবর্তমানে সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে। এই সময় সেখানে হানা দিলে হয়তো সবকিছু দখল করা অনেক সহজ হবে। বাস্তবে তো সেটাই হয়েছিল। সে কারণেই বিদ্রোহীদের কর্ণগড় দখলটাকে শিরোমণি শান্তমনেই মেনে নেয়। মেনে নেয় বলেই বিদ্রোহীদের কেবল ক্ষমাই করেনি, তাদের মতো সব-হারানো মানুষের প্রতিবাদ আন্দোলনকে সমর্থন করে তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। কেবল মুখের কথায় নয়, তাদের জুগিয়েছে অর্থ ও বুদ্ধি। লড়াইয়ের কৌশল ঠিক করার ক্ষেত্রেও সাহায্য করেছে নানাভাবে। কোম্পানির সরকারের বিষনজরে পড়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও তাদের থেকে নিজেকে দূরে রাখেনি। বরং আগের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় হয়েছে।

অজিত সিংহ বেঁচে থাকার সময় তো বটেই তাঁর মৃত্যুর পর জমিদারির একটা বড়ো অংশের অধিকারী হয়েও বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে রানি শিরোমণি খুব একটা মাথা ঘামায়নি। তার একটা কারণ, বড়ো রানি ভবানী। রানি হিসেবে কর্ণগড়ে পা রাখার পর থেকে রানি ভবানীই ছিল শিরোমণির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অবলম্বন ও আদর্শও। সে কারণে দিদি হিসেবে মেনেছে যাকে তাকে ডিঙিয়ে সম্পত্তির ব্যাপারে তৎপর হতে পারেনি। কিন্তু ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে রানি ভবাণীর মৃত্যুর পর পরিবর্তিত অবস্থায় রানি শিরোমণিকে অবশ্যই সক্রিয় হতে হয়।

অন্যান্য ব্যাপারে সক্রিয় হলেও জমিদারির বৈষয়িক দিকটা দেখাশোনার দায়িত্বটা ছিল ত্রিলোচন খানের ওপরই। ত্রিলোচনের প্রতি এই নির্ভরতার মূলত দু'টি কারণ। প্রথমত, এই কাজে ত্রিলোচন ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ, কুশলী এবং অবশ্য সৎ। তাঁর সততা নিয়ে কখনই কোনো প্রশ্ন উঠেনি। দ্বিতীয়ত, ত্রিলোচন ছিলেন তাঁদের অতি নিকট জন। সম্পর্কে রাজা অজিত সিংহ এবং ত্রিলোচন খান ছিলেন মামাতো-পিসতুতো ভাই। দু'জনের মধ্যে ছিল খুবই ভাব-ভালোবাসা। দু'বাড়িতে যাতায়াতও প্রায় নিত্যই। সে কারণেই ভবানী ও শিরোমণি ছিল তাঁরই উপর নির্ভরশীল।

এই আত্মীয়তা, দক্ষতা ও সততার কারণেই ত্রিলোচনের মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো মতিরামকে ওই পদে বসানো হয় প্রায় নির্দ্বিধায়। মতিরামের মৃত্যুর পর ওই দায়িত্ব বহন করেন সীতারাম খান। এই সীতারামের পরিবারের সঙ্গে এক ধরনের আত্মিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে শিরোমণি।

রানি শিরোমণিরা যেসময় নাড়াজোলে ছিলেন তখন

সীতারামের বড়ো ছেলে আনন্দরাম শিশু। তার আধো আধো কথা, টলো মলো চলা, সবকিছুই শিরোমণির মাতৃহৃদয়ে একধরণের আলোড়ন তোলে। অনাস্বাদিত অপত্যস্নেহের ধারায় আনন্দরামকে সবসময় যেন অভিষিক্ত করত শিরোমণি। আনন্দরামও ছিল শিরোমণির খুবই ন্যাওটা। সব সময় সে ঘুরতো একবারে শিরোমণির পায়ে পায়ে।

পুনর্দখলের পর রানিরা কর্ণগড়ে ফিরে আসার পরও আনন্দরামকে প্রায়ই নিয়ে আসতো সেখানে। আনন্দরামও কর্ণগড়ে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকত। কর্ণগড়ে আনন্দরাম যে আনন্দ পেত, যেটা নাড়াজোলে তার কাছে অধরাই ছিল। শিরোমণিকে আনন্দরাম মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসত। কথায়বার্তায় এটা সকলের কাছেই স্পষ্ট ছিল, রানির অবর্তমানে আনন্দরামই হয়তো হবে কর্ণগড়ের রাজা। শিরোমণির নিজেরও ছিল তেমনই ইচ্ছা। কিন্তু কাগজে কলমে শিরোমণি কখনই আনন্দরামকে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেনি। যদিও আনন্দরামই ছিল শিরোমণির হৃদয়ের মণি।

রটনা, নাকি—

ক্ষমতা যেন বারুণী। সোজা কথায় ধেনোমদ। তার টানে ভনভন করবে উড়বে মাছি। এটাই স্বাভাবিক। রাজা কিংবা জমিদার এমনকী সাধারণ পরিবারেরও থাকে ওই রকম কিছু মাছি। ক্ষমতা দখলের জন্য ভন ভন করবেই তারা। কান ভাঙাবে, মনে ঢালবে বিষ। এমনই কিছু লোক রানি শিরোমণি আর আনন্দরামের সম্পর্কটা বিষিয়ে দিতে রটায় অনেক কিছু। তারই জন্য রানি শিরোমণিরও একসময় মনে হয়েছিল আনন্দরামও বোধ হয় ষড়যন্ত্রকারী। এই সন্দেহে রানি আদালতেও যায়।

এত সবের পরেও মনে হয়, সবই রটনা। তা যদি না হবে তাহলে রানি কেন এরপরেও 'হেবা নামা' বা দানপত্রের মাধ্যমে তাঁর সমস্ত রাজ্য আনন্দরামকেই দিয়ে যাবে। মৃত্যুর বছর দুই আছে ১২১৭ সালের ১৯, আষাঢ় (১৮১০ খ্রিঃ) ওই আনন্দরামের নামে ওই দানপত্র সম্পাদন করে রানি। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর (১২১৯-এর ভাদ্র) রানি শিরোমণির মৃত্যুর পর ওই দানপত্রের বলে কর্ণগড়-সহ মেদিনীপুরের অধিপতি হয়।

আনন্দরাম অপুত্রক অবস্থাতেই মারা যায়। মৃত্যুর আগে আনন্দলাল এক ইচ্ছাপত্র সম্পাদন করেন। সেই ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী মেদিনীপুরের জমিদারির মালিক হয় ছোট ভাই মোহনলাল এবং পৈতৃক সম্পত্তি নাড়াজোলের সম্পত্তির অধিকার পায় মোজোভাই নন্দলাল। অবশ্য এইসব সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে কম মামলা মোকদ্দমা হয়নি। প্রিভি কাউন্সিলে পর্যন্ত যায় কোনো কোনো মামলা। সেখানেই হয় মামলার চূড়ান্ত ফয়সালা। আর সেসবের মধ্য দিয়েই একসময় কর্ণগড় এবং নাড়াজোল হয় একীভূত। পুরো সম্পত্তির অধিকারী হয় নাড়াজোলের খান বংশ।

সে সব অবশ্য ভিন্ন কথা। ফেরা যাক রানি শিরোমণির কথায়।

বিদ্রোহের পথে

সময়—মানুষের চরিত্র বিনির্মাণের সময়ই নেয় সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা। রানি শিরোমণির জীবনে সময়ই নানা সময় ফেলে নানা মায়ার খেলা। সে খেলা খেলতে খেলতে শিরোমণি হয়ে ওঠে পরিণত।

সাধারণ কৃষকের ঘর থেকে কর্ণগড়ের রানি হওয়ার পর শিরোমণি দেখেছে বৈভব। দেখেছে ঐশ্বর্যের প্রকাশ। আবার স্বামী অজিত সিংহের মৃত্যুর পর বিদ্রোহী গোবর্ধন দিকপতিরা কর্ণগড় দখল করলে রানির জীবনে হঠাৎ-ই আসে অমাবস্যার অন্ধকার। বিপর্যয় কাকে বলে তা বুঝেছে তখন। তারপর প্রতিপদের পর্যায়ক্রমে শিরোমণির জীবনে আবার এনেছে শুক্লপক্ষ।

শিরোমণি বুঝেছে এটাই জীবন। এখানে সবই অনিত্য। সত্য একমাত্র কর্ম। কর্মই মানুষের বর্তমান এবং ভবিষ্যতও। এই সময় তার জীবনবোধকে বিশেষভাবে আলোকিত করে তার চুনিদাদা। চক্রান্তের শিকার হয়ে কর্মচ্যুত হলেও সম্পর্কের অধিকারে চুনিলাল আগের মতোই থাকে শিরোমণির জীবন দিশারি।

নাড়াজোল রাজ বাড়ির সন্তান চুনিলাল। কিন্তু রাজসম্পদের চেয়েও সাধারণ মানুষের প্রতি ছিল তার টান। সেকারণেই ইংরেজের নির্মম শোষণে দেশের সাধারণ মানুষ এমন কী ভূস্বামীরাও সব হারিয়ে একবারে নিঃস্ব হচ্ছিল, তখন চুনিলাল মিশে যায় তাদের সঙ্গে। তাদের সংগঠিত করতে থাকে গোপনেই। সেই গঠনপর্বে ধীরে ধীরে শিরোমণির মননের ক্ষেত্রেও প্রভাব দেখতে থাকে চুনিলাল। শিরোমণিও হয়ে উঠতে থাকে সাধারণ অভিজাত নিম্নবর্গীয়দের লড়াইয়ের শরিক।

কেবল চুনিলালের শিক্ষা বা জীবনদর্শন নয়, পারিপার্শ্বিক আরও বেশ কিছু ঘটনা ক্রমেই রানি শিরোমণিকে কৃষক বিদ্রোহের শরিক হওয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। একটা সময় অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে রানির পক্ষে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোনও বিকল্প ছিল না। সময় ও পরিস্থিতিই রানিকে করে তোলে ভারতে প্রথম বিদ্রোহী নেত্রী।

দণ্ডেশ্বর শিবের মন্দির থেকে ভেসে আসছে ডমরুর ডমডম শব্দ। যেন মহাকালের ঘোড়া ছুটছে দুর্বার গতিতে। রানি শিরোমণির বুকের ভিতরেও। তীব্র হচ্ছে যেন ওই ধ্বনি। যেন কাছে, আর কেন অলস-বিলাস? এখনও কি হয়নি সময়? আর কবে—কবে—

শিরোমণি স্থির হয়। হয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অবস্থা ক্রমশ যে দিকে চলেছে, তাতে আর দূরে থাকা নয়। এবার আসতে হবে সামনে। হাতে তুলে নিতে হবে হাতিয়ার।

রানি শিরোমণির এই সিদ্ধান্তে আসার কারণ হয়ে ওঠে বিদেশি ঔপনিবেশিক শাসক। বঙ্গের মানুষের মেরুদণ্ডটা ভেঙে দেওয়ার জন্য তারা করে যাচ্ছে একটার পর একটা আঘাত। ভূমি সংস্কারের নামে বড়লাট কর্ণওয়ালিস যে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা বলবৎ করে, তাতে একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হলো কেবল কৃষক-পাইক এবং সাধারণ মানুষই জমিহারা হয় না, ছোটো-বড়ো জমিদার,

ভূস্বামীরাও অনেকেই রাতারাতি সব হারিয়ে একবারে পথে এসে দাঁড়ায়। ধূমায়িত হতে থাকে ক্ষোভ ও ক্রোধ। যেন আগ্নেয়গিরির লাভা। উত্তপ্ত হচ্ছে—ফুটছে—জ্বালামুখ দিয়ে উদ্‌গীরণের প্রহর গুনছে।

ইংরেজ বেনিয়া সরকারের ওই নীতির খাড়ায় বিক্ষত হলো রানি শিরোমণির কর্ণগড় ও মেদিনীপুরের সম্পত্তিও। সরাসরি এই আঘাতে শিরোমণি উদ্বিগ্ন—প্রত্যাঘাত করার জন্য ক্রমশ সক্রিয়।

রানির বিরাগ কেবল নিজের সম্পত্তি বা স্বার্থে নয়, রানির দুশ্চিন্তা দেশের সাধারণ মানুষের জন্যও। কার্যত সর্বস্ব হারানোর মানুষগুলির স্নায়ু বিবশে কোম্পানির দালালরা গোপনে যেভাবে আফিং বিলোচ্ছে বিনা পয়সায় তাতে রানি রীতিমতো ক্রুদ্ধ।

মানুষের কায়িক ও মানসিক শক্তি এরকম চোরাপথে বিফল করে দেওয়াটা মানবতার চরম অবমাননা বলে মনে হল রানির। একইসঙ্গে জমিজমা কেড়ে নেওয়া মানুষগুলির উপর কোম্পানির কর্তা এবং তাদের পুলিশ ও দালাল ইজারাদাররা যেভাবে অত্যাচার চালাচ্ছিল তাও রানিকে প্রকাশ্য বিরোধিতায় সরব হতে উদ্বুদ্ধ করল। এরই মধ্যে রানির জমিদারিতেই রতন সিংহ, রাম সিংহ, রঞ্জিত মহাপাত্র প্রমুখ সর্দার তহসিলদারদের কোম্পানি বরখাস্ত করল। রানির এবার স্পষ্ট নির্দেশ, খতম করো নির্দয়-নিষ্ঠুর খাজনা আদায়কারী রামমোহন রায়কেও। বিদ্রোহীরা প্রজাদের সঙ্গে একই সারিতে শামিল এবার রানি শিরোমণি।

১৭৯৪-এ ইংরেজ শাসক এক ফতোয়ায় রানির জমিদারি বাজেয়াপ্ত করায় শিরোমণির নিজেকে অপমানিত ও অন্যায় অবিচারের শিকার বলে মনে হলো। কৃষকদের আর্থিক দুর্গতি এবং জমিদারিরই কিছু সন্দেহভাজন কোম্পানির কর্মকর্তাদের সঙ্গে দহরম মহরম রানিকে বিচলিত করে তোলে। চরম আঘাত হানার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞ হয় রানি শিরোমণি।

ইংরেজকে প্রত্যাঘাত করার প্রস্তুতি হিসেবেই রানি শিরোমণি কতকগুলি আগাম ব্যবস্থা নিতে থাকে। রণকৌশলের অঙ্গ হিসেবে রানি বিদ্রোহী প্রজাসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাদের সুসংহত করার জন্য তৎপর হয়। তাতেই রানিকে সমর্থন করার সবরকম আশ্বাস দেয় উপজাতি সর্দাররা।

ইংরেজের শোষণনীতির ফলেই অনিবার্য হয়ে ওঠে কৃষক ও সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ। জমি নিলামে তোলা, নিষ্কর জমিকেও সকর করা, স্থানীয় শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত পাইকদের বরখাস্ত করে পশ্চিমি কায়দায় পুলিশি ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে জমি-বাস্তু ও কর্মচ্যুত মানুষ শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ওই রকম একটা অবস্থায় রানি শিরোমণি তাদের সমর্থনে এগিয়ে আসায় তাদের বল ও ভরসা দুটোই বেড়ে যায়।

রানি শিরোমণিও সফলভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার তাগিদে জঙ্গল মহলের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা ছোটো বড়ো জমিদারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রক্রিয়াটি সচল রাখে।

আর এইভাবেই রানি শিরোমণি ইংরেজ সরকারের ওপর বড় ধরনের আঘাত হানার প্রস্তুতি চালাতে থাকে।

রানি ধীমতী। রানি প্রায় নিরক্ষর। কিন্তু সহজাত বুদ্ধি ও প্রতিভায় অতুলনীয়া। অধ্যয়নের সুযোগ ছিল না রানির কিন্তু অধ্যবসায়ের সাহায্যে বহু বিষয়ে রানি হার মানায় ধুরন্ধর সব প্রবীণকে। বঙ্গের মেয়েরা সেযুগে অনেকেই পড়াশোনার সুযোগ না পেলেও সাংসারিক বুদ্ধিতে পোড়খাওয়া রাজনীতিকদেরও ঘোল খাওয়াতে পারতেন। সেই ধারাতেই শিরোমণি জমিদারি পরিচালনার কূটকৌশল আয়ত্ত করে প্রায় অনায়াসে।

একইভাবে নিয়মমাফিক শরীরচর্চার সুযোগ না পেলেও সাঁতার কাটার মতো দেশজ ব্যবস্থাতেই শরীরটা বেশ ভালোভাবেই গড়েছিল রানি। ছোটোবেলায় গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে সমানতালে নানা খেলা বা দুষ্টুমিতে এগিয়ে থাকার ফলে প্রথাসিদ্ধ অস্ত্র শিক্ষা না করলেও তরবারি চালনায় রীতিমতো দক্ষই ছিল রানি।

With Best Compliments From -

GURDEV SHARMA

(DEVI)

Cashier BJP Punjab & Incharge Central Constituency Ludhiana

689, Issa Nagri Puli, Ludhiana - 141 008

(Punjab) India

গ্রামে থাকার সময় গোরু-মহিষের পিঠে চেপে গোষ্ঠভ্রমণ ছিল তার একটি প্রিয় খেলা। অশ্ব চালনাটাও রপ্ত করে গ্রামে চড়ে বেড়ানো কিছু ঘোড়াকে ধরে। এইভাবে শিরোমণি প্রায় সব বিষয়েই ছিল একজন কৃতবিদ্য। আর সেই কারণেই রাজা অজিত সিংহের মৃত্যুর পর সাময়িক শোক ও বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলিয়ে শক্ত হাতে জমিদারির চলমান রথটির কর্ণধার হয়ে ওঠে শিরোমণি।

রানি এভাবে সক্রিয়ভাবে জমিদারির হাল ধরায় সাধারণ প্রজারা খুবই খুশি। কেবল সুশাসন নয়, রানির কোমল হৃদয়ের ছোঁয়া প্রতিমুহূর্তে অনুভব করে প্রজারা। একজন সফল প্রশাসক বা রাজা জমিদারের মতোই যে কোনো সমস্যা মোকাবিলা করার ক্ষমতা ছিল রানির। দক্ষতা বা বুদ্ধির নিরিখে নয়, রানি সবকিছু বিচার করত হৃদয় দিয়ে। সব অর্থেই রানি ছিল করুণাময়ী, অপরের দুঃখে অন্তর কাঁদত তার। শক্তি বা রুক্ষ বাস্তবতার নিরিখে বিচার না করে সংবেদনশীলতার সঙ্গে সব কিছু দেখার কারণেই রানি সব প্রজার কাছেই সমব্যাথী ও স্নেহময়ী জননী হয়ে ওঠে।

শুরু চক্রান্ত

রানির এই উত্তরণে অসহ্য হয়ে ওঠে অনেকে। রানির নায়েব যুগলচরণ তাদেরই একজন। স্বভাবে যুগলচরণ শিয়ালের চেয়ে ধূর্ত। হায়নার চেয়েও হিংস্র। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সবকিছু করতে পারে। এব্যাপারে তার কাছে নৈতিকতা, মানবতা বা সম্পর্কের কোনো মূল্য নেই। একইসঙ্গে শকুনিমামা আর বিশ্বাসঘাতকের যুগলমূর্তি সে। তার মধ্যে রয়েছে একটা সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। সব গ্রাস করতে চায়। ভোগ করতে চায় সব কিছু একাই।

কর্ণগড়ের নায়েব তখন চুনিলাল খান। তারই অধীনে শুরু তার কর্মজীবন। প্রথম থেকেই ওই নায়েবের গতির দিকেই পড়ল নজর। ওটা তার চাই, তা যে করেই হোক।

শুরু হলো নানা কারসাজি, কারচুপি। কান ভাঙানো, জাল জোচ্চুরি। তার ফল ফলল কিছুদিনের মধ্যেই। রাজ পরিবারের অমন সে বিশ্বস্ত নায়েব চুনিলাল, তাকে বরখাস্ত করে যুগলকেই নায়েব করেন রাজা অজিত সিংহ।

লক্ষ্যের প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়েই থেমে থাকল না যুগলচরণ। সে এবার রাজা হতে চায়। কিন্তু অজিত সিংহ বেঁচে থাকতে যে সেটা সম্ভব নয় তা বুঝেই অপেক্ষা করতে থাকে। সে জানে রাজা অপুত্রক। তার মৃত্যু পর্যন্ত তাই চুপচাপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। বুদ্ধিমান যুগলচরণ তাই তলে তলে কাজ গুছোতে থাকে।

রাজা অজিত সিংহের পর সবকিছুর মালিক হলো রানি ভবানী আর শিরোমণি। যুগলচরণ ভেবেছিল, এবার শুরু হবে তার দিন। কিন্তু দুই রানিই নাড়াজোলের রাজা ত্রিলোচনকে সব দায়িত্ব দেওয়ায় যুগলচরণের যেন বাড়া ভাতে ছাই পড়লো। গোপনে গোপনে তাই আরও সক্রিয় হতে থাকে সে।

কিছুদিনের মধ্যেই মারা গেলেন ত্রিলোচন। দেশের পরিস্থিতিও দ্রুত বদলাতে থাকে। বণিক ইংরেজ রাজা হয়েই নানাভাবে উৎখাত করে দেশের কৃষক, পাইক ইত্যাদি খেটে খাওয়া মানুষকে। সব হারিয়ে ওইসব কৃষক-পাইক প্রভৃতি সর্বহারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ওইসময় তাদের পাশে দাঁড়ায় তাদের মাতৃস্বরূপা রানি শিরোমণি। গোপনে গোপনে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে থাকে রানি। দুর্বার হয়ে ওঠে আন্দোলন। সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে ইংরেজ।

যুগলচরণ এবার তৎপর। সটান হাজির ইংরেজ শিবিরে। বলে 'কর্ণগড় থেকে আসছি'। সাহেবদের সঙ্গে কথা আছে।

—কথা?

—হাঁ, কিছু সওদা করতে চাই আমি।

—সওদা?

ভ্রূ কুঁচকোয় সাহেবদের। তা দেখে নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে যুগলচরণ বলে, আমি হলাম কর্ণগড়ের নায়েব। সেখানকার সবকিছু আমার নখদর্পণে। সেইসব খবর আমি বেচতে চাই। তোমরা কি কিনবে?

খেলতে চায় সাহেবরা। বলে, কী খবর? তাতে আমাদের লাভ কী? অযথা সেসব খবর কিনবো কেন আমরা।

যুগলচরণ বলে, দেখ সাহেব, নাচতে এসে ঘোমটা টানার নীতিতে আমি বিশ্বাসী নই। আমি জানি শিরোমণি তোমাদের মনে ভয় ধরিয়েছে। তোমরা ভয়ে কাঁপছ। কী করে রানিকে বাগে আনবে তাই ভাবছ!

—ভয়! কে বলেছে তোমাকে এসব কথা। আমরা খামোখা রানিকে ভয় পাব কেন?

কুটিল হাসিতে মুখ ভরিয়ে যুগলচরণ বলে, দেখো আমার কাছে লুকিয়ে কোনো লাভ নেই। সব জানি আমি তাই সোজাসুজি বলছি, আমি তোমাদের রানির সব খবর দিতে চাই। রানির গোপন পরিকল্পনার কথা আগাম জানলে তোমাদের যে সুবিধে হবে তা আমি জানি। তাই বলছি, কিনবে খবর?

—তা কী দাম দিতে হবে তোমার ওই খবরের জন্য?

—বেশি কিছু নয়।

—তবুও শুনি?

যুগলচরণ বলে আমি ওই কর্ণগড়ের সিংহাসনে বসতে চাই। রানিকে ধরিয়ে দেবো। বদলে চাই ওই সিংহাসন।

হাসে সাহেবরা। আবার সেই বিশ্বাসঘাতক হাজির তাদের দুয়ারে। এসেছে অযাচিত ভাবেই। তাই আঁতাত করে যুগলচরণের সঙ্গে, পেতে থাকে খবর।

ইংরেজরা রানি শিরোমণিকে নিয়ে সত্যিই ভয়ে ভয়ে আছে। কখন যে কোন দিক থেকে হঠাৎ হানা দেবে তা কেউ জানে না। এই তো কিছুদিন আগের কথা। শ'তিনেক বিদ্রোহী আচমকা হানা দিয়ে তাদের অস্ত্রাগার থেকে সবকিছু লুঠ করে নিয়ে পালায়। ওই বিদ্রোহী দলকে নাকি শিরোমণি নিজে নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু সব খবর ঠিক ঠিক না পাওয়ায় কিছুই করা যায়নি সেভাবে।

তবে একা যুগলচরণ নয়, ইংরেজরা খবর জানার জন্য

নিজেরা বহু চর নিয়োগ করেছে। তারা কেউ ভিখিরি, কেউ সন্ন্যাসী বা ওইরকম কিছু সেজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে খবর আনছে। তবে ভেতরের খবর জানার জন্য একজন লোকের দরকার ছিল। যুগল চরণকে পেয়ে সে দিক থেকে কিছুটা সুবিধাই হলো ইংরেজের। এখন তারা আরও সুনির্দিষ্টভাবে ভেতরের খবর পাচ্ছে।

সেইসব খবরের ভিত্তিতেই মেদিনীপুরের কালেকটর কলকাতার ওপরওয়ালাদের জানায়, কর্ণগড়ের রানি শিরোমণির গতিবিধি মোটেই সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না। শিরোমণি যে কোনো মুহূর্তে নাড়াজোল রাজার আত্মীয় চুনিলালের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চোয়াড়দের নেতৃত্ব দিতে পারে। তাই অবিলম্বে সেনা পাঠিয়ে শিরোমণির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কালেক্টর বেশ জোরের সঙ্গে তাঁর রিপোর্ট লেখেন। চুনিলাল-শিরোমণি জোট ভাঙতে না পারলে সমূহ বিপদ। দেশের শান্তিরক্ষাও বেশ কঠিন হয়ে উঠবে।

কালেক্টর অন্য এক রিপোর্ট লেখেন, গুপ্তচর (যুগলচরণ) জানাচ্ছে বিদ্রোহীরা নিয়মিতভাবে কর্ণগড়ে এসে রানির পরামর্শ নিচ্ছে। লড়াই চালানোর জন্য নাড়াজোল থেকে চার গোরুর গাড়ি অস্ত্রও আমদানি করা হয়েছে।

টনক নড়ে কোম্পানির কর্তাদের। রানি শিরোমণি-সহ জঙ্গল মহলের সব জমিদারদের হুঁশিয়ারিপত্র পাঠাতে বলা হয়। চোয়াড়দের কোনোরকম ভাবে সাহায্য বা আশ্রয় দিলে ফল হবে মারাত্মক। একই সঙ্গে কোম্পানির নির্দেশে চোয়াড়দের বিরুদ্ধে শুরু হলো লাগামছাড়া অত্যাচার। রানি শিরোমণিও এবার প্রায় প্রকাশ্যে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসে। ইংরেজও প্রতিশোধ নিতে রানির জমিদারি পরিচালনার অধিকার কেড়ে নেয় ১৭৯৪ এর ১৮ জানুয়ারি।

অবশ্য এই প্রথম নয়। কৃষক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ৮ জুলাই কর্ণগড়ে সীতারাম খান ও বনসুরাম (বাঞ্ছারাম) বক্সিকে বন্দি করে মেদিনীপুরের ফৌজদারি আদালতে সোপর্দ করা হয়। আর বিদ্রোহে মদত দেবার অভিযোগে রানিকেও সতর্ক করে ইংরেজ। বলে, ভবিষ্যতে এমন অপরাধে ফাঁসি দেওয়া হবে। এরপর ১৭৯০-তে ১১৯৫ টাকা খাজনা বাকির দায়ে রানির খাজনামুক্ত 'নানকর' জমি ক্রোক করে ইংরেজ সরকার।

ইংরেজ সরকারের এই ধরনের নিপীড়ন, অত্যাচার রানির জেদটাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। রানি বোঝে ভয় পেয়েছে ইংরেজ। সাপ যেমন ভয় পেয়েই ছোবল মারে, ইংরেজের অবস্থাও এখন তেমনই। তাই তৎপরতা বাড়ে রানির।

ইংরেজের ওপর বড়ো আঘাত হানার জন্য রানি এবার রণকৌশলে শান দেয়। আধুনিক আগ্নেয় অস্ত্রে বলীয়ান ইংরেজ যে কোনও মুহূর্তে সবশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তির ধনুক,

ANOOPAM

METAL INDUSTRIES

ISO 9001-2000 Certified

An ISO 9001 : 2015 Certified Company

Manufacters & Exporters of :

CYCLE PARTS & AIMEX BRAND ALLEN BOLTS-NUTS, GRUB SCREW & TURNING PARTS

B-6, Textile Colony, Industrial Area A, Ludhiana - 141 003 (India)
Tel. (O) : 0161-2226591, 2222326, 4652326
e-mail : anoopam_met@hotmail.com, www.anoopammetal.com

লাঠি-সড়কি নিয়ে সামনা সামনি তার মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। সে কারণেই রানি জোর দেয় চোরাগোপ্তা আক্রমণে। আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলে গেরিলা যুদ্ধ—সেটাই হলো রানিরও যুদ্ধকৌশল।

শুধু হাতে নয়, ভাতেও ইংরেজকে মারার পথটাও নেয় রানি শিরোমণি। গোপনে হুকুম জারি হয়, ইংরেজ বা তার তাঁবেদার মহাজন, ইজারাদার বা পুলিশকে কোনো কিছু বিক্রি করা চলবে না। খাদ্যদ্রব্য থেকে জল সব কিছু সরবরাহ বন্ধের নির্দেশ দেয় রানি। সেই সঙ্গে কড়া হুঁশিয়ারি, এটি যে মানবে না তার গর্দান যাবে—অন্যথা আর কিছু নয়।

ইংরেজের বিরুদ্ধে এধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি জোতদার ও কৃষক বিরোধীদের জমির ফসল কেটে তা সাধারণের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া শুরু হলো। সব মিলিয়ে ইংরেজ ও তার সহযোগীদের একবারে কোণঠাসা করাই ছিল রানি শিরোমণির লক্ষ্য।

রানির রণকৌশল, চুনিলাল খানদের যোগ্য নেতৃত্ব আর স্বজনহারাদের বেপরোয়া প্রতিহিংসার লড়াইতে সারা জঙ্গলমহল তখন উত্তেজনায় যেন বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণের মতো টগবগ করে ফুটছে। বিদ্রোহীদের ভয়ে থরহরি ইংরেজ শাসক বার্তা পাঠাচ্ছে কলকাতায়, বাঁচাও। অবিলম্বে অনেক-অনেক সেনা পাঠাও নাহলে মরবো আমরা সকলে।

এই ধরনের 'বাঁচাও', 'বাঁচাও' বার্তা পাওয়া মাত্রই কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম থেকে মেদিনীপুরে সেনা পাঠানো সম্ভব হয়নি। কলকাতা থেকে সেনা আসতে একটু দেরিই হয়। আর সেই সুযোগই নিতে চায় রানি।

ইংরেজকে বিভ্রান্ত করতেই রানি এক বার্তা পাঠায় মেদিনীপুরের কর্তাদের কাছে। রানি জানায়, বিদ্রোহীরা এখন পাত্তা দিচ্ছে না তাকেও। তারা এখন কর্ণগড় আক্রমণের ছক কষছে। এরকম অবস্থায় নিজের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত রানি কোম্পানির সঙ্গে সন্ধি করতে চায়। কর্ণগড়ের সুরক্ষায় কোম্পানির সরকার অবিলম্বে সেনা পাঠাক—এমনই করুণ আর্তি ছিল রানির বার্তায়।

রানির এহেন বার্তা পেয়ে ইংরেজ কর্তারা রীতিমতো বিভ্রান্ত। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারেও দেখা দেয় দ্বিমত। প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে রানি কি সত্যিই বিপন্ন? নাকি এটা রানির কোনো চাল? ইংরেজ সেনাদের ফাঁদে ফেলার কোনো চক্রান্ত নয়তো এটা? উল্টো দিকেও আবার সেই একই ধরনের প্রশ্ন, রানি যদি সত্যিই বিপন্ন হয়, তাহলে কি তাকে রক্ষা করা উচিত নয়? রক্ষা করলে তো জঙ্গলমহলে সরকারের বড়ো সহায় পাওয়া যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসবের প্রেক্ষিতেই একদল বলে, রানির ডাকে সাড়া দেওয়া হোক। পাঠানো হোক সেনা। অন্যজনের বক্তব্য, রক্ষা করলেও রানি যে পরে ভোল বদলাবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? আর সত্যিই রানি বিপন্ন হলে তো তাদের একটা বড়ো শত্রু নিকেশ হয়ে যাবে বিদ্রোহীদের হাতে। তো শাপে বর, লাভ তো তাদেরই। তাহলে খামোখা সেনা পাঠানো কেন?

সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে ওই টালবাহানার মুহূর্তে সেখানে হাজির যুগলচরণ। জানায়, রানির ওই সন্ধির কথা একটা চাল। সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে রানি সময় কিনতে চায়। আর ওই ফাঁকে আরও সংগঠিত করতে চায় বিদ্রোহীদের। একই সঙ্গে কোম্পানি সেনাদের ভাগ করে দুর্বল করতে চায়। তাই সন্ধি নয়, এই মুহূর্তে রানিকে আক্রমণ করাটাই সঠিক পথ। তাছাড়া রানি এসময় আবাসগড়ে রয়েছে। কর্ণগড়ের তুলনায় আবাসগড় এখন কিছুটা অরক্ষিত— এটাও মনে রাখবেন।

শনি আর রাহু

সে সন্ধ্যায় আবাসগড় দুর্গে রানি শিরোমণি তখন কিছুটা চিন্তামগ্ন। সাহেবরা কি তার সন্ধির প্রস্তাবে সাড়া দেবে, নাকি—

ওই সময় বাইরের একটা গোলমালে শিরোমণির চিন্তার সুতোটা ছিঁড়ে যায়। রানি তাড়াতাড়ি বাইরে আসে। দেখে একজন ভিখিরির মতো লোককে ধরে বেদম মারছে একজন প্রজা। রানি জানতে চায় কারণটা।

সকলে একসঙ্গে বলে ওঠে এই লোকটা কোম্পানির একজন চর। ছদ্মবেশে জোগাড় করছি খবর। কথাটা শুনে শিরোমণি ভালো করে দেখে। দেখেই চমকে ওঠে, একী, এ কি সেই! অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, তুমি?

লোকটির মুখে কেমন যেন একটা বাঁকা হাসি। রানি তাড়াতাড়ি বলে, ওকে ছেড়ে দাও।

কিন্তু ওতো ইংরেজদের চর। আমাদের শত্রু। প্রায় একসঙ্গে বলে ওঠে সকলে। চরের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। বলুন কীভাবে হত্যা করা হবে ওকে।

রানি বলে, যা বললাম তাই করো, যাও তোমরা। ওকে যা শাস্তি দেওয়ার তা আমিই দেবো।

রানির কথায় চলে যায় সকলে। শিরোমণি লোকটিকে টেনে নিয়ে আসে দুর্গের মধ্যে। বলে তুমি—তোমার এই বেশ।

—হ্যাঁ, ঠিকই চিনেছো। আমি জনার্দন।

—তা এতদিন পরে, এখানে?

—তোমাকে দেখতে এলাম।

—আমাকে?

—হ্যাঁ, তোমাকে। দেখতে এলাম সেই সর্বনাশের আশীর্বাদ কীভাবে ফলছে।

—কী দেখলে?

—আর দেরি নেই। ফলবে আমার আশীর্বাদ। তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে শিরোমণির কণ্ঠ, দেখা হয়েছে তো, এবার যাও—যাও এখান থেকে।

একইভাবে বলে জনার্দন, শাস্তি দেবে না।

—দেবো তো। শিগগির বেরিয়ে যাও এখান থেকে। না—সদর দরজা দিয়ে নয়। এসো আমার সঙ্গে।

দুর্গের গোপন দরজা দিয়ে জনার্দনকে বের করে দিল শিরোমণি বলে, যাও, চলে যাও—আর কোনোদিন এসো না এখানে।

জবাবে একটা তীক্ষ্ণ হাসিতে চারিদিক কাঁপিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় জনার্দন। যা জানার তা জানা হয়ে গেছে তার। এবার ফলবে তার আশীর্বাদ—সর্বনাশ—চরম সর্বনাশ হবে শিরোমণির।

সেখান থেকে জনার্দন চলে যায় ইংরেজ শিবিরে। জানায় আবাসগড় দুর্গের গোপন দরজার কথা।

যুগলচরণ আর জনার্দন। রানি শিরোমণির জীবনে দুই দুষ্ট গ্রহ—শনি ও রাহু। দুজনের দৃষ্টি একসঙ্গে পড়ল রানির ওপর। এরপর যা হলো তার জন্য মোটেই তৈরি ছিল না শিরোমণি।

বন্দি হলো রানি

দিনটা ছিল ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের ছয় এপ্রিল। ইংরেজ বাহিনী সেদিন একইসঙ্গে আক্রমণ করে আবাসগড় আর কর্ণগড় দুর্গে। সেই অতর্কিত আক্রমণে বন্দি হয় চুনিলাল খান, রানি শিরোমণি এবং বিদ্রোহের আরও কয়েকজন নায়ক। তারপর শুরু হলো বিচার। পঁচিশ বছর আগে যে বিচারের প্রহসনে ফাঁসি হয় মহারাজা নন্দকুমারের—সেই বিচার!

প্রথমে মেদিনীপুর, তারপর কলকাতা আবার মেদিনীপুর অবশেষে প্রিভি কাউন্সিল দিল চূড়ান্ত যায়। যাবজ্জীবন বন্দি থাকতে হবে রানি শিরোমণিকে। যদিও ইংরেজ মামলাটা সাজিয়েছিল শিরোমণির ফাঁসির জন্য। আর সেইভাবে মামলা সাজাতে মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন কর্ণগড় দুর্গ থেকে বাজেয়াপ্ত করা বেশ কিছু যুদ্ধাস্ত্র পেশ করে। সেগুলির মধ্যে ছিল, ২৭টি গাদা বন্দুক, ৪টি বিলাতি গাদা বন্দুক, ২৫টি তলোয়ার, ৪টি যুদ্ধ কুঠার, ৪টি বল্লম, ১০টি ছোট গোল ঢাল, ৫টি বাঁশের ধনুক, ১৪টি তির রাখার ছোট থলি, ৯টি ছোরা, ৪টি গুঁড়া বারুদের বস্তা এবং একটি রুপোয় মোড়া ছোট তলোয়ার।

শিরোমণির বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে কোম্পানির সেনাবাহিনীর এই অস্ত্রগুলি বয়ে এনেছিল। পুরো ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত হাস্যকর। এরচেয়ে কিছু বেশি অস্ত্রতো দেশের অনেক ছোট জমিদারের ঘরেও থাকে। তাহলে কী হবে? এসব যে ইংরেজের পেশ করা অস্ত্র। এর গুরুত্ব অন্যরকম!

প্রাথমিকভাবে ইংরেজ ফাঁসি দিতে চেয়েছিল শিরোমণিকে। সেই ভাবেই মামলা সাজাচ্ছিল তারা। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ইংরেজ বুঝতে পারে রানিকে মৃত্যুদণ্ড দিলে উত্তাল হবে গোটা জঙ্গলমহল। কৃষক বিদ্রোহ স্তিমিত তো হবেই না, বরং তা হয়তো দাবানলে পরিণত হবে। আর সেই আশঙ্কা থেকেই মত বদল করে বেনিয়া কোম্পানি। মৃত্যুদণ্ড না দিয়েও শিরোমণিকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে আবাসগড় দুর্গেই আটকে রাখা হয়।

কর্ণগড় নয়, জীবনের শেষ তেরোটা বছর শিরোমণি কাটায় আবাসগড়েই। সেটা বন্দি না মুক্ত জীবন তা হলফ করে বলা শক্ত। শিরোমণি দণ্ডিত হবার পরই নাড়াজোলের অধিপতি সীতরাম খানের ছেলে আনন্দরাম মধ্যস্থের ভূমিকায় নেমে রানিকে মুক্ত করেন। কিন্তু মুক্তি খোলা আকাশে নাকি পাখির অভয়ারণ্যে তা বলা যায় না।

* * * * *

২০২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে পেছন পানে হাঁটলে ২১৪ বছর আগে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে আবাসগড়ে রানি শিরোমণির মৃত্যু হয়। তারপর থেকে পারাং নদী দিয়ে বয়ে গেছে বহু জল। একদা তরঙ্গসংকুল পারাং এখন স্রোতহীন প্রায় মৃত এক নদী। কর্ণগড়ের অবস্থাও প্রায় তাই। রানি শিরোমণি এখন বন্দিকন্যা, অরণ্যবন্দি, অরণ্যবালিকা ইত্যাদি নামাবলীতে কিংবদন্তীর এক বীরাঙ্গনা নারী। তাঁর জন্মের ১৬ বছর পরে জন্ম ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের। তাই তিনি নন, বঙ্গের শিরোমণিই ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারিণী প্রথম রণরঙ্গিনী। প্রথম নারী স্বাধীনতা সংগ্রামী শিরোমণি তাই 'বঙ্গের লক্ষ্মীবাঈ' নন, লক্ষ্মীবাঈ-ই 'ঝাঁসির রানি শিরোমণি'।

ইতিহাসের বহু চরিত্রের মতো রানি শিরোমণির মৃত্যু নিয়েও আছে নানা কাহিনি। কেউ বলেন, রানিকে গুপ্ত হত্যা করা হয়েছিল। কারো মতে, জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। অন্য কথায়, দুর্গে স্বাভাবিক কারণেই জীবনাবসান হয় তাঁর। তবে জনচিত্তে তিনি এক অমর রমণী। সে কারণেই তির বেঁধা পাখির শেষ গানের মতোই লোক কবির কণ্ঠে কান্নার লহর তোলে গান—

'কর্ণগড়ের রানি মাগো অস্ত্র ধরেছিল,
কলকাতার লোক উকে চুয়াড় বলেছিল।' □

With Best Compliments from -

ARIES ENGINEERS

JALANDHAR
PUNJAB
M: 9815479543



দ্রোহকাল (২০২৩ - ২০২৬)

সুজিত রায়

আকাশে উড়ছে যে শকুনগুলো
ওদের নামও শাসক!
মাটিতে যে শেয়ালগুলো ছুটে বেড়াচ্ছে
তাদের নামও শাসক!
তোমাদের বুকে যে আগুন জ্বলছে
তার নাম ভালবাসা!
তোমাদের মস্তিষ্কে যে ঝড় বইছে
তার নাম যন্ত্রণা।
.....
আর মোমবাতি নয়, এবার জ্বালাও মশাল
ওরা মানুষ নয়, জন্তু নয়, ওরাই গণতন্ত্রের কঙ্কাল!
জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও অভিশপ্ত রাত
জ্বলুক ধর্ষক, পুড়ুক খুনি, চক্রান্তকারীদের বিষাক্ত হাত।
রাত দখল চাইছে ন্যায় বিচার, চাইছে বর্বরতার ছাই।

—রাত দখল ঃ সন্দীপ গোস্বামী

সাল ২০২৪। তারিখ ১৪ আগস্ট। নাম না জানা, পরিচয়হীন একরত্তি মেয়ে রিমঝিম সিনহা 'মুখ বইয়ের' একটি পাতায় ডাক দিল—Reclaim the Night। রাত দখল করো। ডাঃ অভয়ার হত্যার, ডাঃ অভয়ার ধর্ষণের জবাব চাই, শাস্তি চাই। চল, আমরা মেয়েরা রাত বারোটার পথে নামি। হতে পারে রিমঝিম প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী। হতে পারে রিমঝিম গবেষক। তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় হতে পারে বাম অথবা ডান। কিন্তু সেদিনের রাত দখলের ডাকে কোনো রাজনীতির রং ছিল না। তাহলে? তাহলে কেমন করে

গোটা কলকাতায়, গোটা রাজ্যে, গোটা দেশের প্রান্তরে প্রান্তরে, গোটা মহাদেশের অন্দরে কন্দরে ছড়িয়ে গেল সেই তিনটি শব্দ—রাত দখল করো। Reclaim the Night। আর তার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মেয়ে খালি হাতে (না কারোর হাতে হাতা খুন্তি ঝাঁটাও ছিল না) পথে নেমে পড়ল। সবার মুখে এক দাবি—We want justice —আমরা বিচার চাই। অভয়া হত্যার বিচার চাই।

সে এক উত্তাল প্লাবন। তরুণী, যুবতী বেরিয়ে পড়েছে মাকে সঙ্গে নিয়ে। মা বেরিয়ে পড়েছে কচি সন্তানের হাত ধরে। শত্রুতা ভুলে সব মেয়ে হাত ধরেছে সবার। মায়েরা সেদিন কেউ বলেননি— গভীর রাতে কোথায় যাস বাছা! মেয়েরা কেউ ভয় পায়নি। বলেছিল—মা, আমরা আমাদের বাঁচার জন্য রাস্তায় নামছি। হাতে আর মোমবাতি নেই মা। এবার আমাদের হাতে হাতে মশাল। ধর্ষক এগিয়ে এলে ওর পুরুষাঙ্গ পুড়িয়ে ছাই করে দেব। তুমিও চল আমার সঙ্গে জীবন ধন মন প্রাণ বাঁচাতে।

এক অদ্ভুত উন্মাদনা। এক অদ্ভুত উদ্বেলতা। মধ্যরাতে শহর থেকে গ্রাম, সমতল থেকে পাহাড়, মরুভূমি, বরফে আচ্ছাদিত কানাডার শহর, শহরতলী, জার্মানির কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের গা ঘেঁষে শুধু মেয়েদের মিছিল। শুধু মেয়েদের উত্তাল কণ্ঠ। একটাই দাবি—We want Justice।

কেউ কখনও দেখেনি কলকাতায়? কেউ কখনো ভেবেছে, কলকাতার ডাক পৌঁছে যাবে এশিয়া মহাদেশের বাঙ্গালির কণ্ঠেও? না ভাবেনি, তাহলে এমনটা হলো কী করে?

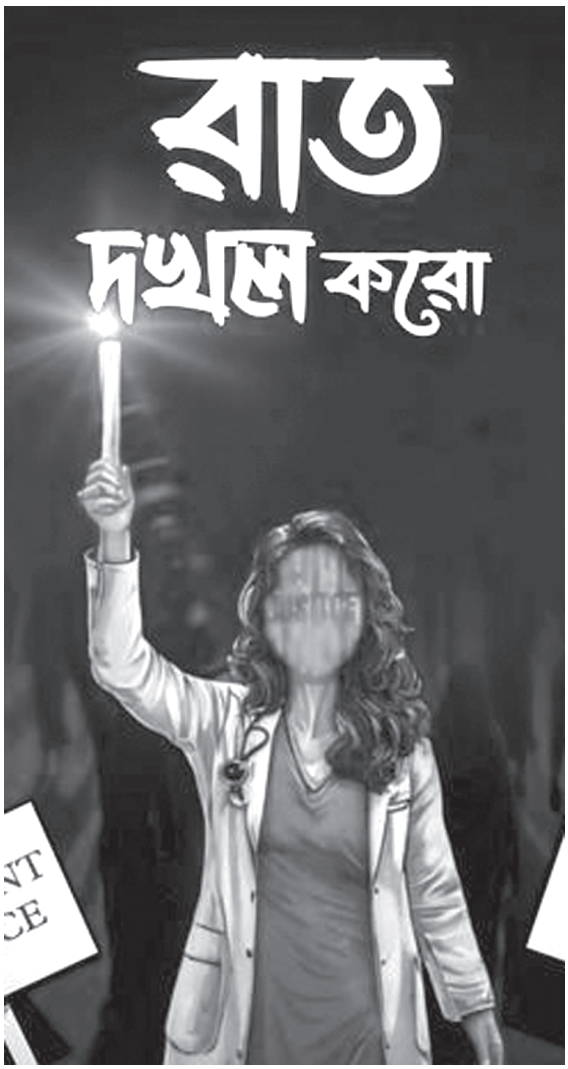
সেদিন অনেকেই বোঝেননি—২০২৪-এর ১৪ আগস্টের রাতে পশ্চিমবঙ্গের মাটি একটা নতুন রং ধারণ করেছিল। বাম ও অতিবামপন্থীরা সেই আন্দোলনকে লালরঙা করতে চাইলেও এরাজ্যের জাগ্রত, জাতীয়তাবাদী জনতার সম্মিলিত সেই জন-আন্দোলনের ভিত্তি ছিল কবিগুরুর সেই অমোঘ বাণী—'ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান!' মুখ বই (ফেসবুক), হোয়াটস্‌অ্যাপ, এক্স-হ্যান্ডল, ইনস্টাগ্রামের মতো সামাজিক মাধ্যমে বামপন্থীরা ফতোয়া দেয় যে, এই আন্দোলনে শাঁখ বা ভারতের জাতীয় পতাকা হাতে কেউ যেন শামিল না হয়। কিন্তু তাদের ফতোয়া অগ্রাহ্য করে পশ্চিমবঙ্গের বুকে 'মানবধর্ম' রক্ষার আন্দোলনে শামিল হন অগণিত মানুষ। গভীর রাতে অসংখ্য জাগ্রত জনতার স্রোতে প্লাবিত হয় এরাজ্যের অজস্র রাজপথ। শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হয় আকাশ-বাতাস। সেই বিদ্রোহের মাটিতে সেদিনই বীজ পোঁতা হয়েছিল রাজ্যের স্বৈরাচারী শাসক, স্বৈরাচারী সরকার, স্বৈরাচারী প্রশাসনের নাম ও নিশান মুছে দেওয়ার। যারা বোঝার তারা বুঝেছিল রাত দখলের ডাক শুধু মেয়েদের আত্মসম্মান, আত্মশ্লাঘা এবং আত্মজাদের বাঁচানোর ডাক ছিল না। এ ডাক ছিল এক সার্বিক বিদ্রোহের, এক সর্বগ্রাসী বিপ্লবের। গত ৫৪ বছরের স্বার্থপুষ্টির রাজনীতি, মানুষের পকেট থেকে রাজ্যের কোষাগার পর্যন্ত খালি করে দিয়ে সিরিয়ার বাশার-আল-আসাদ কিংবা তিউনিসিয়ার জিন আল আবিদিন বেন আলি অথবা ফিলিপিন্সের ফার্দিনান্দ মার্কোসের মতো একনায়ক হয়ে ওঠার যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা গত ৫৪ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে শেকড় গেড়ে বসেছিল এবং শেষ পনেরো বছরে রাজ্যটাকে যেভাবে শুধুমাত্র অপরাধীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করা হয়েছিল, রাত দখলের ডাক ছিল সেই শিকড়কে উপড়ে ফেলার ডাক। দুর্ভাগ্য শাসকদলের, ক্ষমতার নেশা, অর্থের গরিমা, আত্ম-অহঙ্কারের মদমত্ততায় এ যাবৎ এ রাজ্যের শেষতম 'হিটলার' বুঝতে পারেননি, তিনি যুগাবতার নন। তিনি দেবী নন। হিরণ্যকশিপুর বুক চিরে রক্তপানের জন্য যেমন প্রহ্লাদের জন্ম হয়েছিল, তেমনই লক্ষ লক্ষ নারী পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে তৈরি হয়ে বসেছিল একটি সুযোগের অপেক্ষায়। না, ধ্বংসাত্মক বিদ্রোহ নয়। এ দ্রোহের মশালের আগুনে রাজ্য পোড়ে না। শাসক পোড়ে। কিন্তু শাসকই বোঝেনি—

নারীরা জেগেছে দুর্গার মতো
করবে আঁধার জয়।
তিলোত্তমায় নব পিশাচের হাতে
তিলোত্তমার মৃত্যু যেন না হয়।
.....
রাতের দখল নিচ্ছে মেয়েরা
শুনে নাও দুর্বৃত্ত।
মানুষরূপী অসুর নিধনে
কাঁপবে না মা'র চিত্ত।

পাঁচ দিন আগে

মাত্র পাঁচ দিন আগেই ৯ আগস্ট কলকাতার আরজি কর হাসপাতালের অভ্যন্তরে মিলেছিল এক জুনিয়র ডাক্তার তথা ছাত্রী ডাঃ মৌমিতা দেবনাথের মৃতদেহ। রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন। হয়তো-বা ধর্ষিতাও। আইনি কবজ রক্ষায় তার নাম ছড়িয়েছিল মুখে মুখে কখনও অভয়া, কখনও তিলোত্তমা বলে। যে নামেই ডাকি না তাকে—সে আমাদের ঘরের মেয়ে। সে আমাদের সরকার পোষিত হাসপাতালের চিকিৎসক। হাসপাতালের মধ্যেই তাকে এমন নৃশংসভাবে মারল কে বা কারা? কলকাতার পুলিশ কমিশনার থেকে মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর দাসানুদাস আজ্ঞাবাহী চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্ট সমাজ একযোগে ময়দানে নেমে পড়ে দু'দিনের মধ্যেই একজন 'খুনি'কে আবিষ্কার করে ফেলেন। ৩ দিনের এক এমন তদন্ত যা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকেও হার মানায়। স্বাভাবিক ভাবেই সরকারি আবরণের আড়ালে দলদাস কলেজের অধ্যক্ষ ও অন্য প্রশাসকরা। রাজ্যের চিকিৎসক সমাজকে অগ্রাহ্য করে, আইন-কানুন, নীতি নিয়মকে কানে পাক দিয়ে সরিয়ে রেখে অভয়ার মা-বাবাকে কিনে নিতে দশ লক্ষ নগদ টাকা পাঠিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। যে টাকা হেলায় ছুঁড়ে ফেলে তিলোত্তমার বাবা মা সেদিন দাবি তুললেন—টাকা নয়, আমার মেয়েকে ফেরত দিন, সেদিন থেকেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর

রণংদেহী মূর্তি ধারণ করলেন। রাতারাতি অভয়া হত্যার যাবতীয় ক্লু সরিয়ে ফেলা হলো, মুছে ফেলা হলো হত্যা এবং হত্যাকারীদের ইতিহাস ও পরিচয়। দুর্গাপুরের ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, রাত আটটার পর মেয়েরা আর রাস্তায় বেরোবে না। জনতা মুচকি হাসল। সে হাসি আসলে এমন এক হাসি যেখানে লুকিয়ে ছিল পরবর্তী বিদ্রোহের চাবিকাঠি। জুনিয়র ডাক্তাররা পথে নামলেন। সঙ্গে চিকিৎসক সমাজের অগ্রবর্তী স্বজন এবং অবশ্যই খোলা সমাজ। সকলেই মনে করিয়ে দিল—২০১২ সালে দিল্লিতে 'নির্ভয়া' ওরফে জ্যোতি সিংহের ধর্ষণ ও হত্যাকারীদের প্রধান মুখ রাম সিংহ নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়েও বলেছিল—'কোনো ভদ্র মেয়েরই রাত ন'টার সময় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো উচিত নয়। একজন পুরুষের হাতে ধর্ষিতা হওয়ার জন্য ওই পুরুষটির চেয়ে মেয়েটি বেশি দায়ী। মেয়েদের কাজ হলো বাড়িতে থাকা। ঘরের কাজকর্ম করা। উল্টোপাল্টা উত্তেজক পোশাক পরে রাতবিরেতে ডিস্কোথেক আর বার-এ উদ্দাম নাচানাচি নয়। .....যখন কোনো মেয়ে একজন ধর্ষকের পাল্লায় পড়ে তখন তার বাধা দেওয়া উচিত নয়। চুপচাপ মেনে নেওয়াই শ্রেয়। তাহলেই পুরুষটি আর ঝামেলা না করে কাজ সেরে চলে যায়।' একেবারে একই সুরের অনুরণন ছিল মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠে। না, সেদিনও বোঝেননি— সে আসছে—দ্রোহ। ঝড়ের মতো, আগুনের মতো।



রাতদখলের পাঁচ দশক

শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রী ইতিহাসের ছাত্রী। তবে হ্যাঁ, ইসলামিক ইতিহাস। তাই বোধহয় কখনও 'আসল ইতিহাস' পড়ার সুযোগ বা ইচ্ছে হয়নি। কারণ রাজনীতির ময়দানে তার টার্গেটই ছিল শুরু থেকে মুসলমান ভোটব্যাংক তৈরি করে ক্ষমতায় আসীন হওয়া এবং মুসলমান তোষণ করে ক্ষমতার তখতে বসে পশ্চিমবঙ্গের শিকড় উৎপাটন করে 'পশ্চিম বাংলাদেশ' বানানো। যদি ইতিহাস নিয়ে চর্চা করতেন, জানতে পারতেন কলকাতায় যে রাতদখল হলো ২০২৪-এ তার আগে দশকের পর দশক জুড়ে হয়ে এসেছে রাত দখলের বিদ্রোহ দেশের নানা প্রান্তে এবং এই প্রত্যেকটি 'রাত দখল'-এর দ্রোহ ছিল স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এক একটি মুষলাঘাত।

রাতদখল ২০১২

জ্যোতি সিংহ ওরফে 'নির্ভয়া'র গণধর্ষণ ছিল অভয়া হত্যার চেয়েও নৃশংস। সভ্য সমাজে রাক্ষসদের আমরা দেখি না। যা দেখি রূপকথার পাতায়। কিন্তু ছয় ধর্ষক মিলে ২০১২-র ৬ ডিসেম্বর রাতে রাজধানী দিল্লিতে একটি বেসরকারি বাসের মধ্যে যে গণধর্ষণ চালিয়েছিল তা কোনো মানুষের কাজ ছিল না। একাজ সম্ভব ছিল রাক্ষসদেরই। যেন সেদিন রাতে রূপকথার পাতা থেকে উঠে এসে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নির্ভয়ার ওপর। সেদিনও পাড়ার মোড়ে মোড়ে, চায়ের দোকানের টেবিলে, বাড়ির খাবার টেবিলে, কলেজের ক্লাসরুমে, কমনরুমে একটাই চর্চা ছিল কেন্দ্রবিন্দু—রাতে মেয়েরা না বেরোলে ধর্ষিত হবে না। মেয়েদের ঘরবন্দি করে রাখার এই ফন্দিফিকিরের বিরুদ্ধে সেদিনও রাতদখল করেছিলেন নাট্যকর্মী জনেরা। ২০১৬ সালে তাদের ডাকেই শুরু হয় Woman walk at midnight (WWaM) কর্মসূচি। নাট্যকর্মী মায়া কৃষ্ণা রাও দিলেন এই কর্মসূচির অনুপ্রেরণা যিনি ২০১২-র ৩১ ডিসেম্বর দিল্লির মুনিরকাতে একটি কবিতা প্রকাশ্যে পাঠ করেছিলেন। কবিতার নাম ছিল 'হাঁটা' (Walk)। অংশত এখানে তুলে ধরছি—

Walk... walk.... walk walk...
Should I... can I...
Not Seven, not eight, not nine, not ten
but after 12 midnight...
I try not to be afraid of dark.
I want to walk; I want to sit on the bus...
I want to lie in the park...

And I want to try not to be afraid of the dark...
If a man doesn't know how to sit...
look... talk with a woman,
a man, a girl, a boy, a partner...
don't walk with him... don't lie with him
... don't vote for him, don't talk for him ...

'হাঁটা' কবিতাটি ছিল প্রত্যক্ষভাবে ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ। এবং ওই কবিতার সূত্র ধরেই নাট্যকর্মী তানেজার Woman Walk at Midnight-এর সূচনা। রাত দখলের কর্মসূচি এরপর আরও প্রবল হতে থাকে।

রাতদখল ২০১৬

পরের প্রতিবাদ গুরুগ্রামে। ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে এক ২৬ বছরের যুবতী গুরুগ্রামে বন্ধুদের সঙ্গে ডিনার করে উবের বুক করে বাড়ি ফিরছিলেন। উবেরের চালক তাঁকে ধর্ষণ করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে মুম্বইতে দেভিনা কাপুর এবং নেহা সিংহ 'Why Loiter' শিরোনামে একটি কর্মসূচি চালু করেন। অনেক মহিলা তাঁদের নেতৃত্বে রাত ১২টা থেকে ৩টের মধ্যে রাস্তায় হাঁটেন। পার্কের বেঞ্চে বিশ্রাম নেন। রাস্তার ধারে চায়ের দোকানে চা খান, সাইকেল চালান।

এবার পাকিস্তানে

দেভিনা ও নেহার এই উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হন পাকিস্তানের নারীবাদী লেখক ও সাংবাদিক সাদিয়া খাত্রি। ২০১৫ সালে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে তিনি Girls at Dhabas কর্মসূচি চালু করেন। উদ্দেশ্য ছিল, পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাতে ধাবায় চা খাওয়া, নিজেদের মধ্যে ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করা, এমনকী রাস্তায় ক্রিকেট খেলাও। কর্মসূচি আরও জোরদার হলো, লাহোরে সাইকেল চালনারত এক তরুণী সাদিয়াকে লক্ষ্য করে এক গাড়ির চালকের কুশ্রী ইঙ্গিত এবং সদর্থক সাড়া না পেয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা সংঘটিত হওয়ার পর। দেভিনা ও নেহা এবার বার করেন সাইকেল মিছিল। প্রতিবাদী গর্জনের ভাষা ছিল—'কটা সাইকেলে ধাক্কা মারবি মার দেখি।'

দিল্লিতে পিঁজরাতোড় আন্দোলন

এটি ছিল এক অনবদ্য আন্দোলন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলের ছাত্রীদের নির্দিষ্ট সময়ের পরে রাতের দিকে হোস্টেল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে গড়ে ওঠে 'পিঁজরাতোড় আন্দোলন'। অর্থাৎ অনেকটা ওই 'কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট'-এর মতোই জোরালো আন্দোলন। মেয়েরা দাবি তুলেছিল—'হোস্টেল জীবন ছিল কারাবাসের মতো ভয়ঙ্কর। এর অবসান ঘটাতে হবে'। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। বিভিন্ন বেসরকারি মেসেও শুরু হয় প্রতিবাদ। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সিদ্ধান্ত নেন, লাইব্রেরির সামনে তারা সারারাত পড়াশোনা করবে। রাস্তায় হাঁটবে এবং বাসে চড়ে গান গাইবে।

বাঙ্গালোরে 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া' আন্দোলন

৩১ ডিসেম্বর। রাজ্যের বর্ষপূর্তি উৎসব। প্রতিবছর ওই দিনে রাতে শহরের প্রাণকেন্দ্র এম জি রোডে বিশাল মানুষের ভিড় হয়। নারীরাও থাকেন পুরুষের সঙ্গে। ২০১৬ সালে বর্ষপূর্তির উৎসব কিন্তু অসহায় মানুষের আর্তনাদের রাতে পরিণত হয়েছিল। বেশ কিছু উচ্ছৃঙ্খল জনতা মহিলাদের মৌখিক অশালীন শব্দাবলী আর বিকৃত অঙ্গভঙ্গী থেকে শুরু করে তাদের শরীরের স্পর্শকাতর অঙ্গে হাত দিতে থাকে। একটা সময় গোটা উৎসব ভরে ওঠে মহিলাদের আর্তনাদে। তারপর উৎসবে হাজির পরিণত ও ভদ্র পুরুষেরা একরকম জোর করেই মহিলাদের ঘিরে তৈরি করে সুরক্ষা বলয়। ঘটনাস্থলে হাজির প্রায় ১৫০০ পুলিশ কর্মীও দুর্বৃত্ত ও কামুক পুরুষগুলিকে শায়েস্তা করতে পারেননি। তারা সুরক্ষা বলয়ের ফাঁক ফোকর গলে মহিলাদের কুর্তি, শাড়ি ধরে টানাটানি শুরু করে বেলেল্লা হাসিমুখে। বহু মহিলা ছুটে পালাতে গিয়ে ওই অমানুষ কামবুভুক্ষু পুরুষগুলির হাতে যৌন লাঞ্ছনার শিকার হন। এই ঘটনার পর শুরু হয় এক নয়া আন্দোলন— Night in My Shining Armour। আন্দোলনের রূপকাররা ডাক দেন মহিলাদের— পথে নামুন। চীৎকার করে স্লোগান তুলুন—'I will go out'। অনেকটা অভয়া আন্দোলনের ধাঁচেই ওই 'We want Justice'-এর মতোই 'I will go out' স্লোগানে কেঁপে ওঠে রাতের বাঙ্গালোরের শহর থেকে শহরতলী। রাত দখল করেন মা-বোনেরা। বৃদ্ধা থেকে নাবালিকা সকলে। আন্দোলন দেখে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায় সেদিনের কামুকেরা। কিন্তু সরকার কারও জবাবদিহি চায়নি। এটাই ট্র্যাজেডি।

বাঙ্গালোরের এই ঘটনা মনে করিয়ে দেয় বহুদিন আগে সেই ১৯৭৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া শহরের Take Back the Night আন্দোলনের কথা। সেদিন শহরের কোনও মহিলা রাতে ঘরে ছিলেন না। ছিলেন রাস্তায়। প্রতিবাদ করেছিলেন গভীর রাতে একা বাড়ি ফেরার সময় শহরের বুকে যুবতী সুশান আলেকজান্ডার স্পিথকে নৃশংসভাবে খুন করার ঘটনার। সেদিনও রাত দখল করেছিলেন মেয়েরাই, মুখে ছিল স্লোগান—Take Back the Night।

পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিই, প্রাচীন লন্ডনের রাতের অন্ধকারে সিরিয়াল কিলার জ্যাক দ্য রিপারের নারী হত্যার সেই একাধিক নৃশংস ঘটনার। একের পর এক ডার্ক লন্ডনের অলিগলিতে খুন হয়ে পড়ে থাকতেন দেহপোজীবিনীরা। জ্যাক দ্য রিপার ওই মহিলাদের বুক থেকে নিম্নাঙ্গ পর্যন্ত চিরে ফেলে কি খুঁজতেন তা

জানা যায়নি। কারণ জ্যাক কোনোদিনই ধরা পড়েনি, এমনকী তেরোটা খুনের পরেও। কিন্তু সেসময় পুলিশ যেসব এক্সপেরিমেন্ট করেছিল তা হলো—রাত ৮টার পরে মহিলাদের পথে নামা নিষিদ্ধ করে আদেশ নামা জারি করার মতো হাস্যকর পদক্ষেপ। যে পদক্ষেপের কথা পশ্চিমবঙ্গের সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছিলেন এক তরুণী রাতের দুর্গাপুরে ধর্ষিতা হওয়ার পর। আসলে মাননীয়া 'বাংলার মেয়ে'র লন্ডনের প্রতি ছিল এক অপত্য টান। তিনি ক্ষমতায় এসেই বলেছিলেন কলকাতা লন্ডন হবে। নিজেও ভাঁওতা দিয়ে 'অক্সফোর্ডের আমন্ত্রণে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছি' বলে সপারিষদ লন্ডনের রাস্তায় মর্নিং ওয়াক করেছেন। হয়তো দুর্গাপুরের ছাত্রীটি রেপড্ হওয়ার পর তাঁরও মনে পড়ে গিয়েছিল জ্যাক দ্য রিপারকে। তাই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের আদেশনামাকে স্মরণ করে বলে দিয়েছিলেন—রাত আটটার পর মেয়েরা আর রাস্তায় বেরোবে না। অভয়া হত্যার পরও সেই একই ফরমান দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর সমস্ত বিকৃত মানসিকতা-প্রসূত আদেশনামাকে ঘৃণাভরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শহর, শহরতলী, গ্রাম-গ্রামান্তরে, রাজ্য থেকে ভিন রাজ্যের, দেশ থেকে দেশান্তরে মহিলারা রাত দখল করেছেন অবলীলায়। একজন ধর্ষকও সেদিন ধারেকাছে ঘেঁষতে সাহস পায়নি। 'Reclaim the Night'-এর অবিস্মরণীয় সেই আন্দোলনের কিছুদিন আগেই সুদূর সুন্দরবন লাগোয়া সন্দেশখালির নারীরা জেহাদি, নারীলোভী শেখ শাজাহান আর তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে দা, বঁটি, কাটারি, ঝাঁটা, হাতা, খুন্তি নিয়ে পথ দখল করেছিল দিনে ও রাতেও। যেন ফিরে এসেছিল সেই তেভাগা আন্দোলনের স্মৃতি। কিন্তু সুজেট? সুজেটকে মনে পড়ে সেই সংখ্যালঘু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েটিকে যাঁকে কয়েকজন বড়লোকের বখে যাওয়া যুবক পার্কস্ট্রিটে ট্যাক্সির মধ্যে গণধর্ষণ করেছিল? সেদিন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কী বলেছিলেন, ভুলে যাননি নিশ্চয়ই। বলেছিলেন, সুজেট দুশ্চরিত্রা। রাতে বারে বা নাইটক্লাবে কি ভালো মেয়েরা যায়? পুরুষের সঙ্গ পাওয়ার রেট নিয়ে গণ্ডগোল থেকে ধর্ষণ। মনে পড়ে কামদুনির সেই কলেজ ছাত্রীর ধর্ষণের ঘটনা যাকে একদল যুবক যথেচ্ছভাবে গণধর্ষণের পর উলঙ্গ দেহটাকে দুই পা ধরে টেনে মাঝখান থেকে চিরে ফেলেছিল? তারাও কি ভুগছিল জ্যাক দ্য রিপার সিনড্রোমে? জানা যায়নি। কারণ তখনকার সেই মহিলা মুখ্যমন্ত্রী যার কাছে ধর্ষণ, খুন, যৌনহেনস্তা—সবই ছিল 'ছোটো ঘটনা', তিনি স্বয়ং প্রতিবাদী মহিলাদের 'মাওবাদী' আখ্যা দিয়ে গোটা ঘটনার মোড় ঘোরাতে চেয়েছিলেন। প্রাথমিক ভাবে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু তার পর?

'দ্রোহকাল'কে চিনতে পারেননি মমতা ব্যানার্জি

প্রবাদ নয়, অতি বাস্তব কথাটি হলো—অশিক্ষা আর অপাত্রের ক্ষমতার দম্ভ অতি ভয়ঙ্কর। তখন যে কোনো জীব নিজেকে ঈশ্বর মনে করে এবং ভেবে নেয়—তিনিই সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতির শেষ কথা। আর এই আত্মম্ভরিতা তত প্রবল হতে থাকে যখন জলের মতো জনগণের ট্যাক্সের টাকা উন্নয়নে কাজে না লাগিয়ে আত্মপ্রচারের বিজ্ঞাপনে ব্যয় করা হয়। তিনি বিজ্ঞাপনে ঝাঁ চকচকে আলো আর অমুখ ভাতা, তমুক ভাণ্ডারে মহিলাদের শাড়ির আঁচলে গুঁজে দিয়ে ধরেই নেই—সব তার কেনা বাঁদি। এরা ভোট দেবে। না দিলে ধর্ষিতা হবে। খুন হবে।

টানা পনেরো বছর পশ্চিমবঙ্গে এটাই চলেছে। মূর্খের স্বর্গবাস। যেমন ভোটপ্রার্থী, তেমনি ভোটাররা। মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়নের নামে ঘুষ দিয়েছেন আর বিশেষত মহিলারা সামান্য প্রাপ্তির বিনিময়ে ঢেলে ভোট দিয়েছেন ২০২৪-এর নির্বাচন পর্যন্ত। মমতা ব্যানার্জি কি ধরেই নিয়েছিলেন—আমৃত্যু তিনিই ঈশ্বরী হয়ে বিরাজ করবেন পশ্চিমবঙ্গের গদিতে আর ধীরে ধীরে সংখ্যালঘু ভোটব্যাংককে 'টুপি' পরিয়ে, নিজে 'হিজাব'-এর মুখোশ পরে রাজ্যকে জামাতি আর জেহাদিদের সাহায্যে বৃহত্তর 'বাংলাদেশে' পরিণত করবেন?

তাঁর স্বপ্নটা তেমনই ছিল। যেমন ওনার সন্তানসম ভাইপো চেয়েছিলেন 'পিসির ঘাড় ভেঙে' একটা অরবপতি হয়ে যেতে পারলেই পিসিকে হটিয়ে মসনদ দখল করবেন রাজ্যের। তিনি হবেন সম্রাট আর শেখ শাজাহান, শেখ জাহাঙ্গির, শওকত মোল্লাদের রইসুল উজারা, ওয়াজির বানিয়ে আওরঙ্গজেব হয়ে উঠবেন। স্বপ্ন দেখা ভালো। কিন্তু আগে থেকে স্বপ্নটাকে যাচাই করে নিতে হয় সেটা দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে কিনা। আসলে কালীঘাটের খালপাড়ের সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত শাসকের এসব শিক্ষা থাকার কথা নয়। একবার প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায়কে আমি একমাত্র শিক্ষিত তৃণমূলি নেতা ধরে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম—'তোমাদের বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে' এটার সঠিক ইংরেজি অনুবাদ কী হবে বলবেন? সৌগতবাবু একটু ভেবে আদ্যন্ত শিক্ষিত মানুষের মতোই জবাব দিয়েছিলেন—'Your demon is at your doorstep'। অনেকদিন আগের কথা। সৌগতবাবুর মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু এতদিনে আমার স্মৃতি থেকে তা মুছে যায়নি তা প্রমাণ হলো সেদিন সেই ২০২৩-এর ১৪ আগস্ট মেয়েদের রাতদখলের ঘটনা ঘটার পর। সেটাই ছিল ইঙ্গিত— 'Your demon is at your doorstep'। সৌগত রায় হয়তো চিনতে পেরেছিলেন। তাই বহুবার সতর্ক করার চেষ্টা করেছেন মমতা ব্যানার্জি। কিন্তু ক্ষমতার দম্ভ তো মানুষকে অন্ধ করে দেয়। তবে ওপর দুর্যোধনসম ভাইপোকে স্নেহ করার বাধ্যবাধকতা।

ভাববার বিষয়— We want Justice কোনো রাজনৈতিক স্লোগান ছিল না। Reclaim the Night আন্দোলনের পিছনে কোনোও রাজনৈতিক দল ছিল না। গোটা আন্দোলনের কোনো নেতা বা নেত্রী ছিলেন না। হয়তো আবেগে, হয়তো দেশবিদেশে রাতদখলের আন্দোলনে ইতিহাসে সঞ্জীবিত হয়ে এবারও গবেষক ঝিলমিল সমাজমাধ্যমে ডাকটা দিয়ে দিয়েছিল। সেটা যে আরও একবার তিউনিসিয়া বা মিশর বিক্ষোভের মতো গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দেবে, রিমঝিম নিজেও জানতো কি? অনেকে সেই রাতের

বাহ্যিক চেহারা দেখে হেসেছিলেন, ঠাট্টা করেছিলেন— আরে ওসব হুজুগ। সেলফি তোলা আর লোক দেখানো বিপ্লবী দাপট সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে দেওয়াটাই মূল লক্ষ্য। অনেকে আবার বাড়ির ৪/৫ বছরের শিশুগুলোর হাতে We Want Justice পতাকা ধরিয়ে দিয়ে পথে নামিয়ে দিয়েছিলেন। ফোটোগ্রাফারদের পছন্দের বিষয় হয়ে উঠবেন, অভিভাবকরা ধরেই নিয়েছিলেন, কিংবা ৯০ বছরের বৃদ্ধাও রাতদখলে নেমেছেন—সেও তো ভালো ছবি।

কিন্তু সবার ভাবনা, সবার ভয়, ভীতি, সবার আতঙ্কের মধ্যেই অতি সংগোপনে অনুপ্রবেশ করেছিল একটা ফুলকি—আগুনের ফুলকি। শিরশিরে উষ্ণ স্রোতের মতো সেই ফুলকি বয়ে গিয়েছিল সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ভেতরে ভেতরে সঞ্চারিত হয়েছিল উত্তাপের সুনামি—একদিনে নয়। টানা ১৫ মাসের যন্ত্রণা থেকে উদ্ভূত অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি ফ্যাক্টর সারা রাজ্যে শাসক তথা সরকার বিরোধী মানসিকতা। স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে সাত সাতটি সরকার পেয়েছে রাজ্য। নির্বাচিত সরকার। কিন্তু এত অপশাসন, এত অরাজকতা, এত অপমান, এত চুরি, এত ডাকাতি, এত মারপিট, এত দাঙ্গা, এত থার্ড গ্রেডেড উৎসব, এত খুন, এত ধর্ষণ বাঙ্গালি আগে দেখেনি। বাম আমল একেবারে ধোওয়া তুলসীপাতা ছিল না। উচ্চমার্গের নেতৃস্তরে নয়, দুর্নীতির জাল ছড়িয়েছিল নীচের স্তরের নেতা কর্মীদের মধ্যে। সিন্ডিকেটরাজ চালু হয়েছিল বাম আমলেই। সেও ছিল মস্তানি। তবে তার শিকড়ের বিস্তৃতি ছিল কম। তৃণমূল আমলে দুর্নীতির শিকড়টা ছড়িয়েছিল মাকড়সার জালের মতো। তাও দলের একেবারে মাথার চুল থেকে পায়ের আঙুলের নখের ডগা পর্যন্ত। চুরি দুর্নীতির এক অনন্ত যাত্রাপথ রচনা করেছিল তৃণমূল সরকার। সরকারের দায়-দায়িত্ব শিকেয় তুলে 'সরকার' নামক সার্কাস পার্টি দুর্নীতির এবং অপশাসনের যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তা লিখতে পারলে একটা নব্য মহাভারত হয়ে যেতে পারে। রাস্তার রিকশাওয়ালা থেকে অটোওয়ালা, সবজিওয়ালা থেকে ফেরিওয়ালা, ছোট-মাঝারি-বড় শিল্পপতি থেকে আরবপতি, প্রমোটার গোষ্ঠী, শিক্ষক থেকে অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রী থেকে শিক্ষনবিশী, চিকিৎসক থেকে নার্স, ঘরোয়া মহিলা থেকে স্বরোজগেরে গিন্নি—সকলকে একটা সুতোয় বেঁধে ফেলেছিল তৃণমূল। সেই সুতোর নাম দুর্নীতি। সেই সুতোর নাম তোলাবাজি, সেই সুতোর নাম অপশাসন। সেই সুতোর নাম মস্তানি। কেউ প্রত্যক্ষভাবে। কেউ পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবাই। শিশু থেকে বৃদ্ধ। বৃদ্ধ থেকে অতি বৃদ্ধ। রাজনীতির জগতে ডান থেকে বাম। বাম থেকে অতি বাম। পনেরো বছর ধরে প্রথমে ছারপোকার মতো রক্ত শুষেছে। ২০১৬-র পর এরা হায়নার মতো নিকৃষ্ট এবং নৃশংস মনুষ্যেতর জীব হয়ে উঠেছিল। সমাজ থেকে রাতারাতি উধাও হয়েছিল মানবিকতা। মানুষে মানুষে সম্মান অন্তর্হিত হয়েছিল। মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল মানবিক মূল্যবোধ, সম্পর্কের পরম্পরা। হাজারে হাজারে স্কুল বন্ধ হয়েছে। বিনা পরিকাঠামোয় জেলায় জেলায় তৈরি হয়েছে মাল্টি-সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। ছিটেবেড়ার ঘরে অথবা অন্ধকার স্কুল/কলেজের দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে খুলে দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় জেলায় জেলায়। শিক্ষক নেই, শিক্ষাকর্মী নেই, ল্যাবরেটরি নেই, লাইব্রেরি নেই। ছাত্র-ছাত্রীই-বা আসবে কেন? বেকারত্ব বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে। আর 'বাংলার দিদি' ব্যানার্জি পরিবারের পিসি ৬ হাজার, ৮ হাজার, ১০ হাজার টাকায় সিভিক পুলিশ, সিভিক স্বাস্থ্যকর্মী, সিভিক অধ্যাপক, সিভিক শিক্ষক পুষে রেখে প্রচার করেছেন—চার কোটি বেকারের কর্মসংস্থান হয়েছে। টাটাকে তাড়িয়ে যিনি বিপ্লব করেছিলেন, মনে করেছিলেন, তিনি বুঝেও বোঝেননি টাটাকে তাড়ানো মানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিল্পকে তাড়িয়ে দেওয়া। বছর বছর 'এগিয়ে বাংলা'-র ঢাক পিটিয়ে কোটি কোটি টাকার মুনাফা ঢুকিয়েছেন নিজের পরিবারে ভাই-ভাইপো, ভাই-বউ, ভাইপো বউ, বোনপো, বোনঝি, জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো, মামাতো, মাসতুতোদের বেনামে। কালীঘাটের গোটা ব্যানার্জি পরিবার রাজ্যের মানুষকে যখন পথে বসিয়ে ভিক্ষে নিতে বাধ্য করেছে, ছাত্রদের, ছাত্রীদের মা-বোন, মাসিমা, কাকিমা, দিদিমা, ঠাকুমাদের, ঠাকুর্দা, দাদুদেরেও। তখন ওঁর পরিবার কিন্তু ধাওয়া করেছে স্বর্ণমৃগকে। সাদা শাড়ি, সাদা চটির মুখোশে সন্ন্যাসিনীর মতো নিজেকে উপস্থাপন করানোও, তাঁর মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যেত নামিদামি পার্লারের পালিশ পড়ে সপ্তাহে ক'দিন।

নাটক, গান, মিম, প্যারোডি, কার্টুন এত বেশি তৈরি হয়নি ভারতবর্ষের কোনো মুখ্যমন্ত্রীকে ঘিরে কোনোদিনও। অথচ ক্ষমতায় এসেই কাটুন আঁকার জন্য অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্রকে জেল খাটতে হয়েছিল। অন্যায় না করেও বরখাস্ত হতে হয়েছিল রোগীদের ঈশ্বর ডাঃ শ্যামাপদ গড়াইকে। আর গত ২০২৬ সালের পর থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে সহ্য করতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ কটূক্তি, প্যারেডি, ব্যঙ্গ, বাক্যবানের লাইভ সমাজ মাধ্যমে। সে এক আশ্চর্য বহমান স্রোত। দেখলে হাসি পায়, শুনলে হাসি পায়। অথচ সেই হাসিই কখন আগুনে পরিণত হয় তা ভুক্তভোগীরা নিজেরাও বুঝতে পারেননি।

'রাতদখল' আসলে এক জন-আন্দোলন

তৃণমূলিরা বলেন— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই একটি 'জন-আন্দোলন'। তাই তাদের চোখে সিঙ্গুর আন্দোলন আর নন্দীগ্রাম আন্দোলনও ছিল জন-আন্দোলন। ওই দুই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই নাকি সরকারে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। যে দলের কোনও নীতি নেই, নৈতিকতা নেই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখের কথাই যেখানে দলীয় সংবিধান, সেখানে জন-আন্দোলন? ছোঃ! সিঙ্গুর আন্দোলন আসলে ছিল শিল্পবিরোধী আন্দোলন, কৃষক-দরদি সাজার আন্দোলন। আর নন্দীগ্রাম আন্দোলন ছিল নন্দীগ্রামের জনতাকে 'ক্ষমতারোহণের সিঁড়ি' বানানোর রাজনীতি।

ভয়াবহ কমিউনিস্ট হার্মাদি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় নন্দীগ্রামের প্রতিবাদী জনতা। বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ধূমায়িত হওয়া সেই তীব্র জন-অসন্তোষকে সুকৌশলে কাজে লাগান তৃণমূলনেত্রী। স্থানীয় মানুষ এই আন্দোলন সংগঠিত করলেও আন্দোলনের পুরো ক্রেডিট নিয়ে নেন তিনি। ২০১১-য় ক্ষমতায় এসে নন্দীগ্রাম আন্দোলনে নিহতদের আত্মবলিদান ভুলে যান তৃণমূলনেত্রী। নন্দীগ্রামে গণহত্যাকারী পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। নন্দীগ্রাম আন্দোলন চলাকালীন এই আন্দোলনে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে মাওবাদী, অতিবামপন্থী আন্দোলনজীবী ও তথাকথিত মানবাধিকাররক্ষাকর্মীরা। মাওবাদী তথা অতিবামেদের বশে রেখে ক্ষমতার তখতে বসার নোংরা রাজনীতি করেন তৃণমূলনেত্রী। এই সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে সত্যিকারের জন-আন্দোলন গড়ে ওঠা ছিল খুব শক্ত ব্যাপার। পশ্চিমবঙ্গের কপাল ভালো, নামহীন, গোত্রহীন একটা অরাজনৈতিক আন্দোলন শুধু 'We want Justice' স্লোগান তুলে সত্যিকারের এক জন-আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল 'রাত দখলের আন্দোলন'। এবং এ আন্দোলনের মুখ মেয়েরাই। একটা মহিলা দুর্বৃত্তের মুখের বদলে হাজার হাজার লক্ষ, লক্ষ, কোটি কোটি মহিলা রাতের ভয়কে দূরে সরিয়ে রেখে ২০২৪-এর ১৪ আগস্ট এক অনাস্বাদিত জন-আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন। যে জন-আন্দোলনের নাম ছিল Reclaim the night। আর সেই জন-আন্দোলনের মধ্যে ছিল স্বাধীনতা দিবসের মধ্যরাতে গৃহকোণের বাসিন্দাদের স্বেচ্ছায় ঘরের চৌকাঠ ডিঙোনোর আহ্বান।

সেই রাতের পর হঠাৎ করেই যেন থমকে গেল মেয়েদের স্পর্ধা। পুরুষরা গলাবাজি করে বলতে শুরু করল, আমরা পাশে ছিলাম বলেই মেয়েরা সাহস পেয়েছিল। অনেকেই বলেছিলেন, এটাই হয়। হুজুগে আন্দোলনের এটাই ভবিতব্য। আর সেই সুযোগে মমতা ব্যানার্জি স্নেহ মমতা সব মাথায় তুলে বলে বসলেন—''এখনও এফআইআর করিনি। যেদিন করব সেদিন বুঝবে।''

হ্যাঁ, কয়েকদিন পরেই বুঝে নিয়েছিল এরাজ্যের জাগ্রত, প্রতিবাদী জনতা ২০২৪-এর ২৭ আগস্ট ডাঃ অভয়ার মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত ও ন্যায়বিচারের দাবিতে 'নবান্ন অভিযান'-এ। ডাঃ অভয়ার হত্যাকাণ্ডের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং আরজি কর হাসপাতালের যে স্থানে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, সেই স্থানে ভাঙচুরের দ্বারা প্রমাণ লোপাটে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে 'নবান্ন অভিযান'-এর ডাক দেয় অরাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন—'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রসমাজ'। রাজ্যের প্রশাসনিক সদর দপ্তরকে ঘেরাওয়ের লক্ষ্যে এই প্রতিবাদী পদযাত্রাকে সমর্থন করে রাজ্য সরকারি কর্মীদের বৃহত্তম সংগঠন— 'সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ'। রাজ্যে মহিলাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দানে পুরোপুরি ব্যর্থ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল— 'দফা এক, দাবি এক— মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ'। নবান্ন অভিমুখে হাওড়া ও কলকাতায় অগণিত প্রতিবাদী মানুষের জনস্রোত আছড়ে পড়লে নবান্নকে ঘিরে পুলিশের ত্রি-স্তরীয় নিরাপত্তা বলয় হয়ে ওঠে অতি-সক্রিয়। আন্দোলনকারীদের ওপর চলে ব্যাপক আকারে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাসের শেল বর্ষণ। জনস্রোতকে প্রতিহত করতে নির্বিচারে জলকামান ব্যবহার করে পুলিশ। 'নবান্ন অভিযান' চলাকালীন সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায় ধরা পড়ে যে, দৃঢ়ভাবে ভারতের জাতীয় পতাকা হাতে একজন গৈরিক বসনধারী প্রবীণ ব্যক্তি নির্ভয়ে জলকামানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আন্দোলনরত যুবসমাজকে ক্রমাগত উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন। জলকামান থেকে নির্গত জলের প্রবল আঘাতে বিচলিত না হয়ে তিনি পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের সংকল্পে অটল থাকার ইশারা করছেন; তাঁর শরীরী ভাষার মাধ্যমে— জলকামানের বাধাকে উপেক্ষা করে আন্দোনকারীদের 'নবান্ন অভিযান' অব্যাহত রাখার আহ্বান জানাচ্ছেন। বলরাম (প্রবীর) বসু নামক ওই ব্যক্তি পরে সংবাদমাধ্যমকে জানান যে, পদযাত্রা নবান্ন পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারলেও তাঁদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর যাতে মুখ্যমন্ত্রীর কর্ণকুহর পর্যন্ত পৌঁছায়, সেই লক্ষ্যেই তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়েছে এই অদম্য সাহসিকতার প্রকাশ।

ডাঃ অভয়ার হত্যাকাণ্ডের ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলনরতদের 'আন্দোলন করার পরিণতি' বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী। ডাঃ অভয়ার হত্যাকাণ্ডের চার মাস পরে ১৪ ডিসেম্বর রাতে প্রতিবাদী জনতা সেই 'পরিণতি' বুঝে নিয়েছিল বিভিন্ন লিঙ্গের মধ্যে লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠাকামী মানুষের মহা সম্মেলন 'স্পর্ধার চিৎকার'-এ। আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের সামনে রানুছায়া মঞ্চে নারী-ট্রান্স-ক্যুয়ার সহ প্রান্তিক এলজিবিটিকিউ মানুষেরা 'অভয়ার দল'-এর সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে রাতের কলকাতায় জমায়েত হয়েছিল। যাদের কথা এতদিন কেউ শোনেনি, সেদিন ওই প্রান্তিক মানুষেরা অন্য মানুষদের শুনিয়েছিল রাত দখলের উৎসব শেষ হয়নি। হতে পারে না।

'অভয়ার ভয় নাই
রাজপথ ছাড়ি নাই।'

এ আন্দোলন আলমারিতে সাজিয়ে রাখা আন্দোলন নয়। এ আন্দোলন বিশ্বাসঘাতকতার আন্দোলন নয়। যেমনভাবে হীরকরানি 'জন-আন্দোলন'-এর নামে স্থানীয়দের 'ক্ষমতারোহণের সিঁড়ি বানিয়ে' নন্দীগ্রামে জিতেছিলেন। মাওবাদীদের সাহায্য নিয়ে এরাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিভিন্ন বিধানসভা আসনে জিতেছিলেন। জনগণকে ধোঁকা দিয়ে সিঙ্গুরে জিতেছিলেন। তারপর মাওবাদী নেত্রী সুচিত্রা মাহাতকে দাবার বোর্ডের বোড়ে বানিয়ে কিষেণজীকে হত্যা করে গোটা মাওবাদীদেরই নিকেশ করে দিয়েছিলেন। কোমর ভেঙে গিয়েছিল সুচিত্রা মাহাতদের। পূর্বতন মাওবাদী পাঁচু রায়, পূর্ণেন্দু বোস, দোলা সেনদের কড়ির বাজারে

কিনে নিয়েছিলেন জলের দরে। নগদা-নগদি হিসেবে।

কিন্তু জন-আন্দোলন সে তো তার নিজস্ব প্রতিবাদের ভাষা নিত্যনতুন করে খুঁজে নেবে। সে আন্দোলন তো কালীঘাটের আরবপতির ঘরে সাজানো থাকবে না। পথেই থাকবে। পথই পথ দেখাবে। এটাই ছিল রাতদখলের মহিমা, সুপ্ত বার্তা।

এক আন্দোলনেই ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল 'বাংলার মেয়ে'র ভবিষ্যৎ। সবাই বুঝেছিল, সব্বাই। শুধু বোঝেননি কালীঘাটের ওই অহঙ্কারী দলনেত্রী যে এমন আন্দোলন সমাজকে নতুনের সন্ধান দেয়। এমন আন্দোলন সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার না করে গণ্ডী ভাঙে, রাজনৈতিক বোধবুদ্ধিতে শান দেয়। মানুষেরাই মানুষকে ভবিষ্যতের দিশা দেখায়। ২০২৬-এর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে সেই দিশা স্পষ্ট হলো। অত্যাচারী শাসক তাঁর নিজের ঘরে হারলো। ৪ মে যখন নির্বাচনের ফল ঘোষণা হচ্ছে, ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পনেরো হাজারেরও বেশি ভোটে হেরেছেন, তখন যেন ভেসে আসছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সেই সার্জিকাল স্ট্রাইকের পূর্ববর্তী ভাষণ—'পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ করেই আমরা পুলওয়ামা হত্যার প্রতিশোধ নেব'। নিয়েও ছিলেন। এবার স্বয়ং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও ভবানীপুরে পা রেখেই নিজের বাড়ির উঠোনে দাঁড় করিয়ে হারিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। রাজ্য জুড়ে দিকে দিকে সে কী উল্লাস! দুপুর গড়াতে না গড়াতেই ৪ মে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল তৃণমূলের বিসর্জন ঘটতে চলেছে। শুধু কিছু মুহূর্তের অপেক্ষা। তারপরেই আবাহন হবে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। যা ছিল স্বপ্নের অতীত—সেটা হলো। ৪ কোটিরও বেশি মানুষের অবিরাম আশীর্বাদ নিয়ে ২০৮টি আসনে জয়লাভ করে বিজেপি। যেন এক বিপ্লবের সাধন হলো। সল্টলেকে বিজেপি অফিসের সামনে সেদিন গেরুয়া আবিরের পরতই বুঝিয়ে দিচ্ছিল বিপ্লব সফল। হবেই তো— বহু আগেই স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার যখন চট্টগ্রামের পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাবে বিধ্বংসী হানা দিয়ে সাহেব মারলেন এবং ধরা না দিয়ে পটাসিয়াম সায়ানাইড চুষে আত্মবলিদান দিলেন, সেদিন তাঁর প্যান্টের পকেটে একটি চিরকুট খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল— LONG LIVE REVOLUTION। এবার পশ্চিমবঙ্গে ভোটের পর যদি মহিলাদের অন্তরে কী লেখা ছিল তা পড়া সম্ভব হতো তাহলে ওই কথাটাই পাওয়া যেত— LONG LIVE REVOLUTION। দীর্ঘ ৩৪ বছরের জরদ্‌গব বামফ্রন্ট সরকারকে মানুষ সরিয়েছিল মমতা ব্যানার্জির কথার মোহে সেটা কোনো বিপ্লব ছিল না। কলকাতা লন্ডন হবে, দার্জিলিং সুইজারল্যান্ড হবে জাতীয় মৌতাতে বুঁদ হয়ে মানুষ সরকার বদলেছিল। সেটা হয়তো ঠিকই ছিল। কিন্তু ভুল ছিল মমতা ব্যানার্জিকে বেছে নেওয়া। তখন মানুষ ছিল নিরুপায়। আর কোনো বিকল্প পথ সামনে ছিল না। আর এর জন্য এরাজ্যের মানুষকেই ১৫ বছর ধরে সর্বস্বান্ত হতে হয়েছে। গোটা রাজ্য দেউলিয়া হয়ে গেছে। একটু দেরিতে হলেও ভুলটা মানুষ বুঝেছে, বিশেষত মেয়েরা। কয়েকটা বছর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রীতে বুঁদ হয়ে থাকলেও অবশেষে ভুল ভেঙেছে। বাঁধ ভেঙেছে ধৈর্যের। মানুষ বুঝেছিল এবার তৃণমূল জিতলে নিজভূমে পরবাসী হতে হবে। বঙ্গের মহান সন্তান ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মবলিদান ব্যর্থ হয়ে যাবে। সর্বোপরি, যে কোনো ছুতোনাতায় কেন্দ্রের বিরোধিতা করে উন্নয়নের নৌকা ভাসানোর অপারগতার গ্লানিতে ভুগতে হবে না। পিসি-ভাইপোর সার্কাস আর চলতে দেওয়া যাবে না। এবার নিজেদের বাঁচতে হবে। মানুষ বাঁচার পথ খুঁজে নিয়েছে। নতুন ভাবনা, নতুন স্বপ্ন নিয়ে এসেছে নতুন সরকার। মানুষের সামনে নতুন দিশা। এবার শিক্ষার হাল ফিরবে। এবার স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত হবে। এবার সংস্কৃতি ফিরবে। আবার ফিরবে সামাজিক সম্পর্ক, মানবিক মূল্যবোধ। অবলুপ্তি ঘটবে স্বৈরাচারের, গুন্ডামির, মস্তানির, কাটমানির, তোলাবাজির, দুর্নীতির, সিন্ডিকেটরাজের। কারণ 'গুন্ডাদের কন্ট্রোলার' মমতা ব্যানার্জি নিজেই সব হারিয়ে বসে আছেন।

ইতিহাসের শিক্ষা— ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না

যথা কর্মঃ তথা ফলম্। আয়নাকে তুমি যেমন দেখাবে সেও তেমনই তোমায় দেখাবে। ইঁট ছুঁড়লে পাল্টা কেউ রসগোল্লা ছুঁড়বে না। Everybody will be paid in his own coin। এ বিশ্বে অপরাধ, স্বৈরাচারের কোনো ঠাঁই নেই। এজন্মের পাপের শাস্তি এ জন্মেই পেতে হবে। মানুষ তাদের চোখে পরানো ঠুলি সরিয়ে ফেলতে পেরেছে। তাই রাতদখলের ডাক। তাই স্পর্ধার চিৎকার। তাই পালাবদলের পালার সাক্ষী থেকে থেকে যাওয়া। ১৯৯২ থেকে ২০২৩। রাজস্থানের ভানওয়ারি থেকে পশ্চিমবঙ্গের অভয়া বা তিলোত্তমা বা মৌমিতা— যে নামেই ডাকা হোক না তাঁকে— পথ ছিল দুর্গম। সেই দুর্গম পথের ঠিকানা ও সমাধানের ছবিটা ফুটে উঠেছিল আগেই ১৯৭৪ সালে— ভারতে মেয়েদের অবস্থান সম্পর্কে সমীক্ষা 'Towards Equality' রিপোর্টের পাতায় পাতায়। সেখানেই উঠে এসেছিল অন্য দেশের মেয়েদের ছবিও— কতখানি স্বাধীন তাঁরা। শক্তি জুগিয়েছিল সেই রিপোর্ট। সময় লেগেছে। ইতিহাস কি একদিনে সৃষ্টি হয়? কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোণায় কোণায় মেয়েরা জেগেছে স্বাধীনতার দাবিতে, স্বরোজগারের দাবিতে, স্বশাসনের দাবিতে। কুচক্রী শয়তান শাসকদের দু'গালে সপাটে থাপ্পড় মেরে বলতে— দূর হ, ফোট্। ছোঁয়ার চেষ্টা করলেই খাসি করে দেব শ্লা! শেষ পর্যন্ত সেটাই হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। নতুন সূর্যের আলো বড় মিষ্টি। বড় স্নেহময়। সুরে সুরে বাঁধা এক সুন্দর সকাল।

(লেখক বরিষ্ঠ সাংবাদিক ও গবেষক)

(কৃতজ্ঞতা : সিউ পত্রিকা বুলেটিন; ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৪)



সাম্প্রতিক

দেবদাস কুণ্ডু

ইদানীং একটা অস্থিরতা নিবারণ চক্রবর্তীকে চঞ্চল করে তুলেছে। সেই অস্থিরতায় সে আজকাল অনেক কিছু ভুলে যাচ্ছেন। বাজারে মাছের দাম দিয়েছেন। বাড়ি এসে চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরিয়েছেন সবে। দু' একটা টান দিয়েছেন। সামান্য ধোঁয়া বাতাসে ছেড়েছেন, এমন সময় ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মল্লিকা বললেন—কী গো মাছ আননি?

সঙ্গে সঙ্গে নিবারণ চক্রবর্তীর ভিতর সংশয় দেখা দিল, মাছ আনিনি!

বললেন—ভালো করে ব্যাগটা দেখতো।

মল্লিকা বললেন—ব্যাগ খুলে দেখেই তো বলছি।

—তাই! দাঁড়াও, বাপনকে একটা ফোন করি।

—কে বাপন? মল্লিকা প্রশ্ন করলেন।

—বাপনের কাছ থেকেই মাছ আনি। ভূতদার ছেলে। আগে বাবার সঙ্গে ছিল। বিয়ে করে আলাদা হয়েছে। আলাদা দোকান দিয়েছে।

—এতো কথা শুনতে চাই না। তুমি মাছ আনো আগে।

সিগারেট টানতে ভুলে গেছেন নিবারণ চক্রবর্তী। আঙুলের ফাঁকে নিঃশব্দে সিগারেট পুড়ছে। ফোনে রিং হয়ে যাচ্ছে। বাপন ধরছে না। মিসকল হয়ে গেল। কী ভেবে আবার ফোন করলেন নিবারণ চক্রবর্তী। এবার ধরেছে। বাপন বলল—

—কে বলছেন?

—আমি নিবারণ চক্রবর্তী বলছি।

—হ্যাঁ কাকু বলুন, কী মাছ লাগবে?

—আমি তো বাজার করেই ফিরেছি। তোর কাছ থেকে কি আজ মাছ নিয়েছি?

—নাতো। আপনি তো আজ আমার দোকানে আসেননি। ফোনটা কেটে দিয়ে নিবারণ চক্রবর্তী আবার সিগারেটে বড়ো করে একটা টান দিলেন। তবে কার কাছ থেকে মাছ নিয়েছি? ঝন্টু না ভোলা? না রাজু? কার কাছ থেকে? না, কিছুতেই মনে পড়ছে না।

—কীগো বসে বসে কী ভাবছো? মাছটা তো আনতে হবে। মল্লিকা তাড়া দিয়ে বললেন—তাড়াতাড়ি মাছ নিয়ে এসো। রান্না করে আমাকে আবার বের হতে হবে।

—কোথায় যাবে তুমি?

—মায়ের বাড়ি।

নিবারণ চক্রবর্তী জানে মায়ের বাড়ি মানে বাগবাজারে মা সারদার বাড়ি।

—সেখানে কী আছে আজ?

সিগারেটে টান দিলেন নিবারণ চক্রবর্তী।

—ভক্ত সম্মেলন।

—কখন?

—দশটায়।

সিগারেট ছাইদানিতে গুজে উঠে দাঁড়ালেন নিবারণ চক্রবর্তী। এর আগে একদিন ব্যাংক থেকে টাকা তুলে হাত ব্যাগটা ফেলে এসেছিলেন কোনো একটা দোকানে। বাড়িতে এসে হাতটা খালি খালি লাগছিল। মনে পড়ল হাতে তো টাকার ব্যাগটা ছিল। সেটা কোথায় গেল? টেনশন শুরু হলো। স্ত্রীকে কিছু বললেন না। লাস্ট মা সারদা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে সন্দেশ



ANU SAREES

ANUSHREE TEXTILES PVT. LTD.

14, Amratalla Street, 2nd Floor, Kolkata - 700 001 (W.B.)
Phone : 033-22351257, E-mail : anusaree@gmail.com

এনেছেন। খাবার শেষে তাঁর একটু মিষ্টি চাই। মা সারদা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার যেতে নিমাইদা ব্যাগটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপনার ফোন নাম্বার আমার কাছে থাকলে একটা ফোন করে দিতাম। টাকার ব্যাগ এভাবে কেউ ফেলে যায়?

নিমাইদাকে বললাম না একটা অস্থিরতায় খুব ভুগছি। তাই ভুল হয়ে যাচ্ছে।

ব্যাগটা খুলে দেখে নিলেন। না, টাকার বান্ডিলটা আছে। পঞ্চাশ হাজার টাকা বলে কথা। হাঁফ ছাড়লেন। ধীরে ধীরে বাড়ি চলে এসেছিলেন।

আজ আবার মাছ ফেলে এসেছেন। ঘর থেকে বেরিয়ে একটু দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। একটা অস্থিরতা সব সময় শরীরের ভিতর হেঁটে বেড়াচ্ছে। মল্লিকার এসব নেই। সারদা মায়ের বাড়ি যাবে মানে আজ দুপুরে মল্লিকা বাড়িতে খাবে না। ভক্ত সম্মেলনে খাবারের প্যাকেট দেবে। মল্লিকা ধর্ম নিয়েই আছে। খুব ধার্মিক সে। ভোর চারটের সময় উঠে ধর্মীয় পুস্তক পড়ে। খাতায় দুর্গা নাম লেখে একশো একবার। জপ করে, সারদা মায়ের বই, ঠাকুরের বই পড়ে। এছাড়া স্নান করে লাল পেড়ে শাড়ি পরে নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো দেয় ঘণ্টা খানেক সময় ধরে। তারপর আধঘন্টা চোখ বুজে গভীর মগ্নতায় জপ করে। মাঝে মাঝে বিভিন্ন মিশনে বেড়াতে যায়। রাত দশটায় মোবাইলে অনলাইনে গ্রুপে ওদের কথামৃত পাঠ হয়। সেখানে কোনো কোনো দিন মল্লিকা পাঠ করেন। কোনো কোনো দিন গ্রুপের অন্য কোনো সদস্য পাঠ করেন। নিবারণ চক্রবর্তী মাঝে মাঝে বলেন, তুমি তো রিটিয়ার করে সম্পূর্ণ ধার্মিক হয়ে গেলে! আমার দিকে একটু তাকাও।

—দেখো ছোটোবেলা থেকে আমি পুজো অর্চনা করি, আমাদের বাড়িতে সব উৎসব হতো। বাসন্তীপুজো, দোল, গনেশপুজো, রামনবমী, লক্ষ্মীপুজো, সরস্বতীপুজো। আমার মা আমাদের রামায়ণ মহাভারত পড়ে শোনাতেন। তখন থেকেই আমার ঈশ্বর ভক্তি ধর্মাচরণ পালন। এতদিন চাকরি করেছি তাই পুজো অর্চনা দিকে মন প্রাণ ঢেলে দিতে পারিনি। এখন ধর্ম-কর্ম করবো না তো আর কবে করব? যার ধর্ম নেই তার জীবনও নেই। আমাদের সনাতন ধর্মই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

—আরে চক্রবর্তীদা হন হন করে যাচ্ছেন কোথায়? আবাসনের ব্যানার্জিবাবু জিগ্যেস করলেন।

—বাজারে।

—একটু আগে তো বাজারে আপনাকে দেখলাম। ঝন্টুর দোকানে মাছ কিনছিলেন।

—ঝন্টুর দোকানে মাছ কিনেছি। দেখুন কাণ্ড! দাম দিয়েছি, মাছ নিয়ে আসিনি।

—ঝন্টু হয়তো রেখে দিয়েছে। কেউ না নিয়ে গেলে পেয়ে যাবেন।

দুই

মাছ ভাজতে ভাজতে মল্লিকা বললেন—তোমার কী হয়েছে বল তো?

ডাইনিং টেবিলে ঝুঁকে কাগজ পড়ছিলেন নিবারণ চক্রবর্তী। পড়তে পড়তে তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। শরীরের ভিতর অস্থিরতা বাড়লে তার ধূমপানের সংখ্যা বেড়ে যায়।

—তুমি বলছো তোমার কিছু হয়নি তাহলে তুমি আজকাল এত ঘন ঘন সিগারেট খাচ্ছ কেন? যখন কোনো কিছু নিয়ে তোমার ভিতর অস্থিরতা বাড়ে তখন তোমার ধূমপানের সংখ্যা বাড়ে। ডাক্তার তোমাকে বলেছেন, ধূমপান ছেড়ে দিতে। কী, বলেননি ডাক্তার ঘোষ?

—হ্যাঁ। তা অবশ্য বলেছেন। নিবারণ চক্রবর্তী কাগজের উপর চোখ রেখেই বললেন।

—হার্টে সামান্য ব্লকেজ ধরা পড়েছে। মেডিসিন দিয়েছেন ডাক্তার ঘোষ। বলেছেন, ধূমপান না ছাড়লে বড়ো রকমের সমস্যা হতে পারে। কি বলেছেন তো? কড়াইতে মাছ উল্টে দিতে দিতে বললেন মল্লিকা।

—হ্যাঁ বলেছেন। তুমি দেখছি ডাক্তারের কথা পাই-টু-পাই মনে রেখেছো।

—মনে রাখবো না কেন? আমাদের তো ছেলে-মেয়ে নেই। ঈশ্বরই একমাত্র ভরসা। আমার কিছু হলে তুমি মনে রাখবে, তোমার কিছু হলে আমি মনে রাখব। এটাই তো দাম্পত্য সম্পর্ক। তুমি মা সারদার কথা ভাবো একবার। ঠাকুরের অসুখের দিনগুলোতে মা সারদা কী রকম সেবা যত্ন করেছেন। দক্ষিণেশ্বরের ছোট্ট ঘরে শিকে জিওল শিং মাছ ঝুলিয়ে রাখতেন মা। সারারাত কলকল করতো মাছ গুলো। ঘুম হতো না মায়ের।

—হ্যাঁ আমিও জানি। ওই রকম মানবী আর আসবেন না এই পৃথিবীতে।

—তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না, কী হয়েছে তোমার? রাতে বারবার বাথরুম যাচ্ছ। তোমার তো সুগার নেই। এক ঘুমে ভোর হয়ে যায়। আজকাল তুমি কথামৃত পড়া শুনছো না আর। আগ্রহ যেন অনেক কমে যাচ্ছে। কী হয়েছে বল না আমায়?

—বলছি তো কিছু হয়নি। সিগারেট নিভিয়ে দিয়ে আবার একটা ধরালেন নিবারণ চক্রবর্তী। মল্লিকার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। সব অবজারভেশন করে। যা কিছু করে গভীর মনোযোগ দিয়ে করে। যখন বই পড়ে তখনও মনোযোগের গভীরে ডুবে যায়। সেদিন দশটা বেজে গেছে। খিদে পেয়েছে তাঁর। অনেক বার ডাকলেন। মল্লিকা ঘর থেকে বের হয়নি। টু রুমের ফ্ল্যাট। সাড়ে ৬০০ স্কোয়ার ফুট। একটা রুমে মল্লিকা থাকে, অন্যটায় থাকে নিবারণ চক্রবর্তী। তিনি একজন লেখক। এত ডেকেও যখন মল্লিকার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, তখন তিনি মল্লিকার ঘরে গেলেন। মল্লিকা হাতে পেন্সিল নিয়ে একটা বইতে আন্ডারলাইন করছিল। এটা ওর স্বভাব। ভালো ভালো জায়গা গুলো মেনশন করে রাখে।

—কীগো তখন থেকে ডাকছি তুমি সাড়া দিচ্ছ না। রাত দশটা হয়ে গেল খাবো কখন?

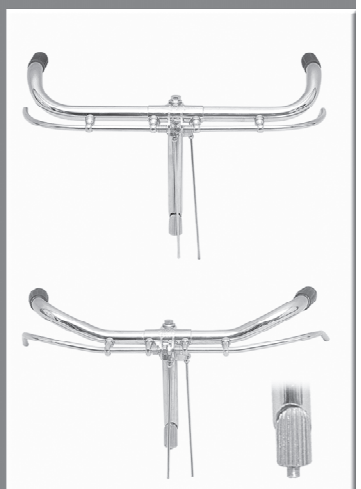
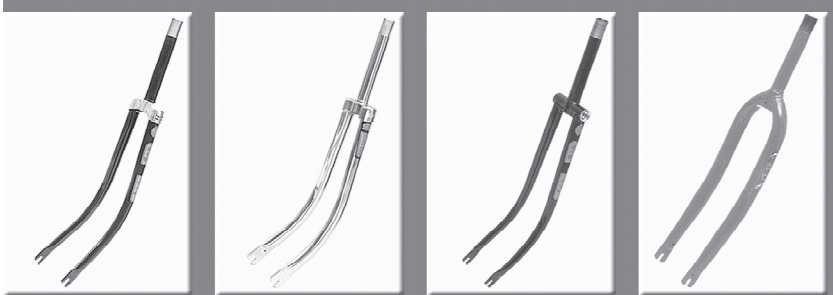
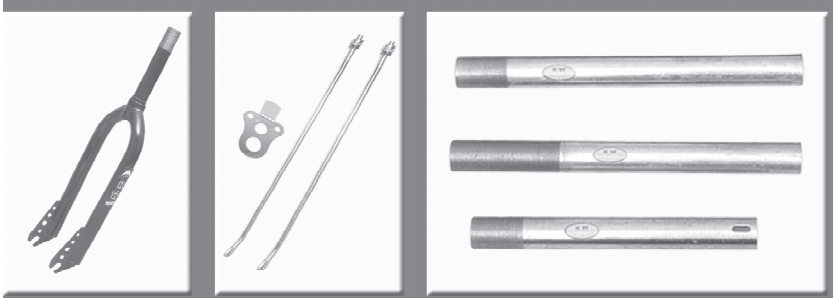
ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মল্লিকা তরাক

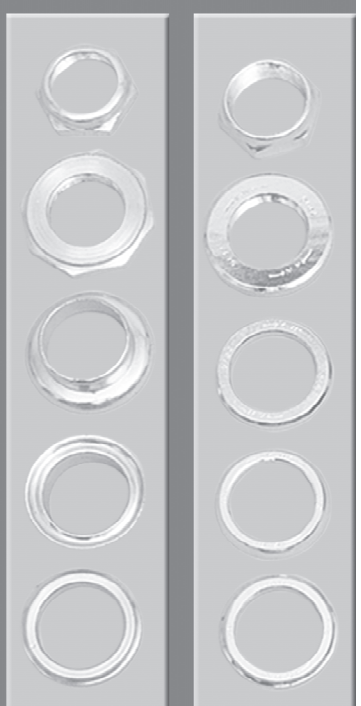






Manufacturers & Exporters of
SUPREME QUALITY BICYCLE &
RICKSHAW PARTS



K. W. Engineering Works (Regd.)

B-11, Phase-II Focal Point, Ludhiana-141010 (Pb) INDIA

Phones : 5010958, 5010960

Email : kwenggworksregd@gmail.com

করে উঠে বইটা বন্ধ করে বলেছিল—চলো খাবার গরম করে দিচ্ছি।

নিবারণ চক্রবর্তী দেখলেন বইটার নাম প্রাচীন ভারতের সাধুদের কথা। আর একদিনের ঘটনা। সেদিন মল্লিকা খেতে খেতে বলেছিল—জানো তো, প্রাচীন ভারতে আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি অনেক উন্নত ছিল।

—হ্যাঁ, জানি। মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে নিবারণ চক্রবর্তী বলেছিলেন।

—কিন্তু কেন আরও উন্নত হলো না আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি সেটাই আমি ভাবছি। মল্লিকা বললেন।

—সেদিন একটা বই না ম্যাগাজিন পড়ছিলাম বলতে পারব না এখন। তবে প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা পদ্ধতি আরও উন্নত হয়নি বৌদ্ধ মতের উত্থানের পর।

— কীরকম? মল্লিকা চোখ দুটো বড়ো করে স্বামীর দিকে তাকিয়ে ছিল।

নিবারণ চক্রবর্তী বলেছিলেন—বৌদ্ধমতের নিয়ম হলো মৃতদেহ ছোঁয়া যাবে না। ফলে মৃতদেহ কাঁটা ছেঁড়া করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল।

—কী গো তখন থেকে শুধু সিগারেট খেয়ে যাচ্ছ।

মল্লিকার কথায় নিবারণ চক্রবর্তী অতীত থেকে ফিরে আসেন। মল্লিকা কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে সিগারেটটা টেনে নিয়ে বাইরে ফেলে দিল।

কাগজ নিয়ে উঠে নিজের ঘরে চলে এলেন নিবারণ চক্রবর্তী। ঘরের দরজার ছিটকিনি দিয়ে দিলেন। এবার আর তার ধূমপানে মল্লিকা বাধা দিতে পারবে না। তিনি মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে কাগজটা পড়তে পারবেন।

তিন

লেখার টেবিলে চুপচাপ বসে আছেন নিবারণ চক্রবর্তী। একটা পত্রিকায় পূজাসংখ্যায় একটা গল্প দিতে হবে। কিন্তু প্লটটাকে কিছুতেই গুছিয়ে আনতে পারছেন না। মনের ভিতরে অস্থিরতা তাকে স্থির ভাবে কিছু ভাবতে দিচ্ছে না। তাঁর ঘুম কমে গেছে। কাজে ভুল হয়ে যাচ্ছে। চেনা মানুষকে অচেনা লাগছে। বই পড়তে ইচ্ছে করছে না। একটা রাগ তাকে তীব্রভাবে অস্থির করে তুলেছে। একটা চেয়ার টেনে পাশে বসলে মল্লিকা।

বললেন—তুমি দেখছি চুপচাপ বসে আছ। তোমার ভিতরে কী হচ্ছে আমাকে কিন্তু এখনো বলনি। যাক, আমি তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

নিবারণ চক্রবর্তী একটা সিগারেট ধরিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন—বল কী বলবে?

—এই যে বাংলাদেশে প্রতিদিন হিন্দুদের উপর নির্যাতন চলছে এর কোনো বিহিত নেই? শুনেছি আগে ২২ শতাংশ হিন্দু ছিল এখন দাঁড়িয়েছে ৮ শতাংশের কম। এরপর কি এটা শূন্যে গিয়ে দাঁড়াবে? একটাও হিন্দু কি আর বাংলাদেশে থাকবে না? এই অত্যাচার তো আজ নয়। স্বাধীনতার আগে থেকেই হচ্ছে। তাই তো আমার বাবা-মা ওই দেশ থেকে এ দেশে এসেছেন। রিফিউজি হয়েছেন। লড়াই করে বাঁচতে হয়েছে।

—আমার বাবা-মাকেও রিফিউজি হতে হয়েছে। ফরিদপুর বাবার বাড়ি ছিল। মাদারিপুর সাব ডিভিশন।

—অবাক কাণ্ড দেখো, একটা সন্ন্যাসীকে জেলে আটকে রেখেছে। তার হয়ে কোনো উকিলকে সওয়াল করতে দিচ্ছে না।

তাহলে সন্ন্যাসীর জামিন হবে কী করে? তিনি কি জেলেই পচে পচে মরবে?

নিবারণ চক্রবর্তী কোনো উত্তর দিলেন না। চুপচাপ সিগারেটের আগুনের দিকে তাকালেন। একটা টান দিলেন।

মল্লিকা বললেন—অনুপ্রবেশ অনুপ্রবেশ করে সবাই চিৎকার করছে। কিন্তু অনুপ্রবেশটা বন্ধ হচ্ছে না কেন?

আরও একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটল সেদিন। একটা ছেলেকে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে গাছে বেঁধে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারলো।

কিছু লোক সেই নিষ্ঠুর বর্বরতার ভিডিও তুলল। এখানেও এক সন্ন্যাসীকে জড়িয়ে অশ্লীলতার সংবাদ বাতাসে ভেসেছিল। আমি মাঝে মাঝে এসব চিন্তা করে আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। বাংলাদেশের নৃশংসতা এখানে না ছড়িয়ে পড়ে। আজ মানুষ বড় বিপন্ন। এসব নিয়ে তুমি ভাবো না? তুমি তো লেখক মানুষ। তোমাকে এসব ঘটনা অস্থির করে তোলে না?

নিবারণ চক্রবর্তী মল্লিকার দিকে গভীর চোখে তাকালেন। তারপর সিগারেটে একটা বড়ো টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—

সাম্প্রতিক এইসব ঘটনাগুলোই আমাকে বেশি অস্থির করেছে। তুমি যে বারবার বলছো না তোমার কী হয়েছে? এর কী জবাব দেবো তোমায়। আমি এসব ঘটনা নিয়ে ভাবতে ভাবতে জীবনের ছন্দটাই ভুলে যাচ্ছি। নিজের ভিতরেও এক ধরনের বিপন্নতা বোধ কাজ করছে। তুমি তো সব সময় থাকো ধর্মকর্ম নিয়ে। এতো সব ঘটনা জানলে কী করে?

—কেন তুমি যখন থাকো না তখন কাগজটা পড়ি। মাঝে মাঝে টিভির খবর শুনি। আমাদের গ্রুপের মধ্যেও আলোচনা হয়। বাসে ট্রেনে টুকরো টুকরো সংলাপ শুনি। আচ্ছা, এসব নিয়ে কিছু লেখা যায় না? তুমি লেখার কথা ভাবছ না?

—ভাবছি। খুব গভীরভাবে ভাবছি। তাই তো একটা অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটছে। ভিতরে ভিতরে রক্তাক্ত হচ্ছি। একটু থেমে নিবারণ চক্রবর্তী বললেন—তুমি তো জানো সাম্প্রতিক অনেক ঘটনা নিয়েই আমি গল্প লিখেছি। নিবারণ চক্রবর্তী আবার সিগারেটে টান দিলেন। তার মনে হলো সিগারেটের আগুনটা দাউ দাউ করে জ্বলছে তার ভিতর।

With Best Compliments From -



A

WELL WISHER

MF

SHREE JAIN VIDYALAYA

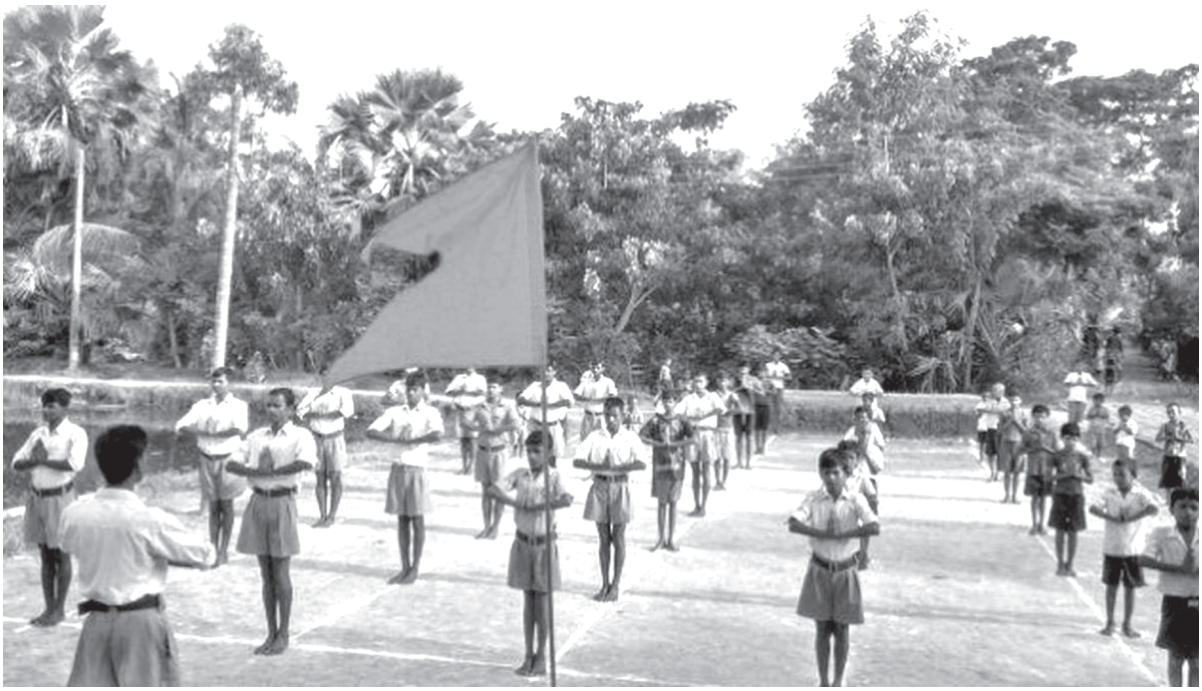
Educational institution in Howrah, West Bengal

Address

25/1, Bonbehari Bose Road, Sandhya Bazar,

Choura Bustee, Shibpur, Howrah, West Bengal- 711101

Phone - 033-22426369



সঙ্ঘ মানে সাধনা

বিজয় আঢ্য

সালটা ১৯৬৮-৬৯ হবে। পশ্চিমবঙ্গের প্রচারকদের মধ্যে আমি তখন সর্বকনিষ্ঠ। সেই এক-দু'বছরের কয়েকটা ঘটনা স্মৃতির দরজায় এখনও টোকা মারে। প্রচারকদের বৈঠক হবে। কলকাতায় সেন্ট্রাল এভিনিউয়ে ঘনশ্যাম বেরিওয়ালজীর বাড়িতে। সিঁড়ি দিয়ে চারতলায় উঠে বাঁ-হাতে বড়ো ঘর। ঘরে তখন তিরিশ-পঁয়ত্রিশজন হবে। তখন যাঁদের চিনতাম তাঁদের মধ্যে ছিলেন বসন্তদা, মাধবদা, অনন্তদা, অমলদা, কেশবজী, বংশীদা, কেষ্টদা (বালকৃষ্ণ নাইক), মধুদা (মধুকর মালসে), রামদা (রামপ্রসাদ দাস), গজাননদা, গৌরাঙ্গদা এবং আরও অনেকে। কালিদা ও কেশবজীকে আগে থেকে চিনতাম। তাঁদের দেখেছি ১৯৫৭ সালে কলকাতার একটা শিবিরে। শিবিরটা হয়েছিল হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজে। ক্লাস ফাইভে পড়ি। শূন্যে সৌধ নির্মাণ করাটা শুনেছি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কাজ খাড়া করে বসন্তদা দেখিয়েছেন যে তা করা যায়। অমলদা জীবনের অনেকটা সময়ই ২৬ নং কার্যালয়ে কাটিয়েছেন। কার্যালয় কেমন হবে তা জানিয়ে বলতেন, স্বয়ংসেবকরা গোমরা মুখে কার্যালয়ে এলেও হাসি মুখে ফিরে যাবে। বৈঠক তখনও শুরু হয়নি। শ্রীগুরুজী একটা বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় রয়েছেন। ক্যানসার ধরা পড়েছে। সুজিতদা (ডঃ ধর) শ্রীগুরুজীর বি পি চেক করছেন। ঠিক এমন সময় অনেকটা স্বগতোক্তির (SOLILOQUY) মতো শ্রীগুরুজী বললেন, 'হাম সব ইহ রাষ্ট্র কা এক-এক বুঁদ হ্যায়।' বৌদ্ধিক নয়, বৈঠক নয়, আলাপচারিতাও নয়। শুধুই স্বগতোক্তি। অন্য কেউ শুনেছেন কিনা তাও জানি না। তবে এটাই আজীবন চলার পথে পাথেয় হয়ে রইল।

শ্রীগুরুজীকে প্রথম দেখি ১৯৬৩ সালে, কলকাতায় রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে। সম্ভবত ১৭ জানুয়ারি। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে। সে বছর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছি। বাচ্চুদা (স্বর্গীয় ভূমানন্দ পাল) ও গৌরাঙ্গদার (স্বর্গীয় গৌরাঙ্গ দাশগুপ্ত) সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলাম। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। কালিদা (স্বর্গীয় কালিদাস বসু) সভা পরিচালনা করছিলেন। পরে শুনেছি ওইদিনের সভায় সভাপতি ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ মাধবানন্দজী মহারাজ। ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৩— এই দশ বছরে শ্রীগুরুজীকে দর্শন করার, বৌদ্ধিক শোনার, বৈঠকে থাকার সুযোগ পেয়েছি। খুব কাছে থেকে সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম ১৯৬৮ সালে ইটাচুনায় সঙ্ঘের শিক্ষা বর্গে। এই বর্গে আমার অধিকারী বিভাগের দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল।

শ্রীগুরুজী খুব গরম চা পছন্দ করেন— অনন্তদা তা পাখিপড়ার মতো বুঝিয়েছিলেন। বস্তুত চা করার ক্ষেত্রে তখন অনেকটাই নবীশ। একটু পরে অনন্তদা এসে বললেন— 'পাশ করেছিস'। তখন ঘাম

দিয়ে জ্বর ছাড়ল মনে হলো।

৬৯-৭০-এ পরপর এই দু-বছরে পশ্চিমবঙ্গে এমন কয়েকটা কার্যক্রম হয়েছিল যেখানে শ্রীগুরুজী উপস্থিত ছিলেন। যেমন১৯৬৯ সালে পাথুরিয়াঘাটার এক ধর্মশালায় বৈঠক হয়েছিল, যেখানে দুটো শাখার দায়িত্ব আছে এমন কার্যকর্তাদের ডাকা হয়েছিল। তখন কাটোয়াতে রয়েছি। এই বৈঠকটা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্ঘের কাজের ইতিহাসে একটা মাইল ফলক। শ্রীগুরুজী এই বৈঠকে শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী অর্থাৎ মাস্টারমশাইকে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্ত সঙ্ঘচালক হিসেবে ঘোষণা করেন। অর্থাৎ এই সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রান্ত কার্যকারিণী গঠন সম্পূর্ণ হলো। সেসময় প্রান্ত স্তরের কার্যকর্তাদের বৈঠকে শ্রীগুরুজী যেসব প্রশ্ন করতেন বা প্রত্যুত্তরে যা বলতেন, তা জেনে ইদানীং অনেকে হয়তো একটু অবাক হবেন এবং তা স্বাভাবিকও। সঙ্ঘের নামের মধ্যে ক'টি শব্দ আছে— তিন না চার? কিংবা সঙ্ঘের প্রার্থনার প্রথম শ্লোকের ভাবার্থ কী? অথবা সঙ্ঘকে বোঝাতে সক্ষম এমন সক্রিয় ও নিরংহকার কার্যকর্তা তোমার ক্ষেত্রে কতজন আছে? প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর লুকিয়ে রয়েছে। শ্রীগুরুজী প্রশ্ন করলেন, কাদের কাদের কার্যক্ষেত্রে এরকম কার্যকর্তা রয়েছে? একজন হাত তুললে শ্রীগুরুজী হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'তুম তো স্বয়ং অহংকারী হো'। 'আমি'-কে কতটা মাটির তলায় পুঁতে দিতে হবে— বোধোদয়ের জন্য এর থেকে যথেষ্ট আর কী আছে? অথবা শ্রীগুরুজীর ভাষণে একটা কথা প্রায় শুনেছি— 'অন্তর্বাহ্য শুদ্ধ হোনা চাহিয়ে'। সঙ্ঘের শতবর্ষ পার হয়েছে। বাস্তবিকই সঙ্ঘ আজ দেশব্যাপী ও সর্বস্পর্শী হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশে বসবাসকারী হিন্দুদের উপরও সঙ্ঘের প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভারতের কেন্দ্র ও অধিকাংশ রাজ্য সরকার হিন্দুত্ববোধে অনুপ্রাণিত মানুষরাই পরিচালনা করছেন। সঙ্ঘ বরাবরই যুগানুকূল পরিবর্তন এবং বিরোধিতার পথে না গিয়ে সকলকে নিয়ে একসঙ্গে চলায় বিশ্বাসী। সঙ্ঘের মূল ভাবনা আবর্তিত হচ্ছে সম্পর্কের উপর, আত্মীয়তার উপর— একটা পরিবারে যেমন হয়ে থাকে। যেখানে আমি নয়— আমরাই। এই আত্মীয়তাবোধের কারণেই সঙ্ঘ ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে (Progressive Unfoldment)।

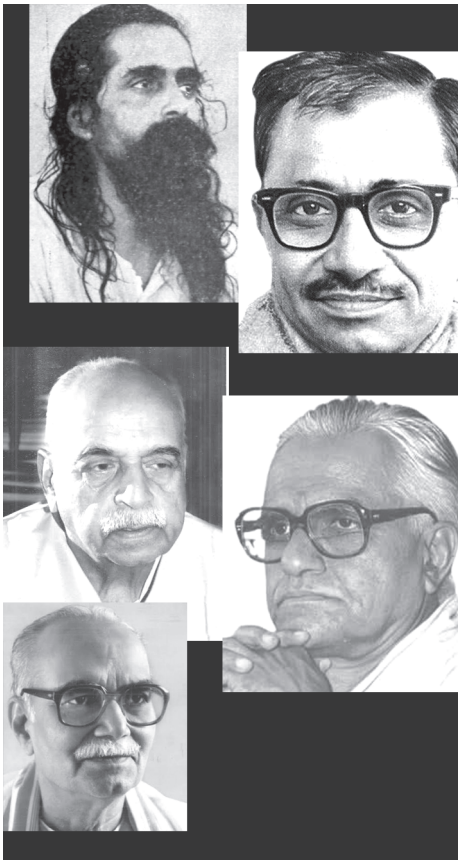
ঘটনা হলো, ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবক এমনই সব পারিবারিক একাত্মতার কথা বলতে পারবেন, যা তাদের চলার পথে প্রেরণা দিয়েছে। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি, তবে ডাক্তারজীর ডান হাত বলে পরিচিতকে দেখেছি। ১৯৬৯ সালে নাগপুরে তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে মাননীয় আপ্পাজী যোশী-র বৌদ্ধিক ছিল। পূজনীয় শ্রীগুরুজীকে যখন 'সরসঙ্ঘচালক' নিযুক্ত করা হয়, তখন সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি ডাক্তারজীর এত পুরনো বন্ধু, বলতে গেলে তাঁর ডান হাত, তবুও আপনার থেকে অনেক নবীন শ্রীগুরুজীকে সরসঙ্ঘচালক করা হলো কেন? উত্তরে আপ্পাজী বলেছিলেন, 'ঠিকই, তিনি ডাক্তারজীর ডান হাত-ই। এখন এই ডান হাত দিয়েই নবনিযুক্ত সরসঙ্ঘচালককে প্রণাম করব। সঙ্ঘের এটাই সংস্কৃতি। এরকমই একটা ঘটনা প্রত্যক্ষ দর্শন করার সুযোগ হয়েছিল ১৯৮৪ সালে নাগপুরে সঙ্ঘের প্রতিনিধি সভায়। সঙ্ঘের তৎকালীন সহসরকার্যবাহ এইচ ভি শেষাদ্রিজীকে সরকার্যবাহ ঘোষণা করে নিজেকে সহ-সরকার্যবাহ রূপে পরিচয় দিলেন মাননীয় রাজেন্দ্র সিংজী (রজ্জু ভাইয়া)। এ এক অনন্য অনুভূতি, যা মানুষকে নত হতে শিক্ষা দেয়।

সঙ্ঘ বরাবরই বলে আসছে— ব্যক্তি নির্মাণের মাধ্যমে রাষ্ট্র নির্মাণ। সঙ্ঘ শুধুই ব্যক্তি নির্মাণ করবে, আর স্বয়ংসেবকরা রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য সব কিছুই করবে— কোনো কিছু ছেড়ে দেবে না। আর ব্যক্তি নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব বৃদ্ধির কৌশলটিও শিক্ষণীয়— যার একটি ইট বহনের ক্ষমতা আছে তাকে দুটো ইট বহনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সঙ্ঘের নেতৃত্ব মূলত নৈতিক ও কার্যক্ষেত্র নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নির্ধারিত। সঙ্ঘ ব্যক্তি নির্মাণের জন্য লিটারেচার, সেমিনার, এডুকেশনাল ট্যুর ইত্যাদিকে অগ্রাহ্য করেনি, কিন্তু জোর দিয়েছে আচরণের উপর— 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও'— এই আপ্তবাক্যের উপর। বস্তুত ষাটের দশক পর্যন্ত বাংলাভাষায় সঙ্ঘসাহিত্য বলে কিছু ছিল না। দশ-বারো পৃষ্ঠার দুটি বই তখন দেখেছি— ব্যক্তিদর্শন ও বিচারদর্শন। দুটি বইয়ের প্রচ্ছদেই শ্রীগুরুজীর ছবি ছিল। স্বস্তিকা-র আর্কাইভ-এ এখনও বইদুটি আছে। যদিও ষাটের দশকের শেষে 'বাঞ্চ অফ থটস্' প্রকাশিত হয়েছে। সঙ্ঘ সম্বন্ধে জানার জন্য বইপত্তরের অভাবের কথা বললে সঙ্ঘের অধিকারীরা তখন বলতেন— 'এত লিভিং লিটারেচর' থাকতে একথা বলছো কেন? এখনও পশ্চিমবঙ্গে এমন কয়েকজন প্রবীণ স্বয়ংসেবক রয়েছেন, যাঁরা এমন অনুভবের কথা বলতে পারবেন। সঙ্ঘের শিক্ষা প্রণালীতে প্রথমে দেখা, পরে শোনা, শেষে পড়াশোনার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

সঙ্ঘ যে ব্যক্তি নির্মাণের পদ্ধতি নিয়েছে তা সর্বদাই 'পজিটিভ'— ইতিবাচক। যেমন ধরুন, একটা ছোটো বালতিতে ময়লা জল রয়েছে। এই বালতিতে পরিষ্কার জল দেখতে চান। এখন এই বালতিতে যদি বেশ কিছুটা সময় ধরে পরিষ্কার জল ঢালতে থাকা হয় তাহলে কিছুক্ষণ পরে ওই বালতির জলও পরিষ্কার হয়ে উঠবে। উদাহরণ, একটা চিঠিতে লিখেছিলাম, আপনি অমুক তারিখে আসবেন। চিঠিটা দেখে অনন্তদা বলেছিলেন, লেখো— আপনি অমুক তারিখে এলে ভালো হয়। সামান্য লেখাতেও বিনয়ের ভাব থাকা দরকার। কিংবা শাখার পরে বা কোনো বৈঠকের শেষে খবরের কাগজের উপর বেগুনি বা আলুর চপ দিয়ে মুড়ি খাওয়া হচ্ছে। কিন্তু বেগুনি বা চপটা এঁটো করিনি। হাত দিয়ে ছিঁড়ে খাচ্ছি। কেননা, কেউ যদি হঠাৎ এসে পড়ে তবে তাকেও ভাগ দেওয়া যাবে। কাউকে কথা দিলে তা রাখার জন্য সঙ্ঘের রীতির কথা বলতে গিয়ে মাননীয় একনাথজী (কন্যাকুমারীতে স্বামী বিবেকানন্দ মূর্তির প্রধান পুরোহিত) বলতেন, 'রঘুকুলরীত সদা চলি আঈ / প্রাণ যাঈ পর বচন না যাঈ।' তৃতীয় পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেবকে বলতে শুনেছি, 'you will correct Swyamsevaks without stupid' — একটা ছুঁচ ফোটালে যে ব্যথা লাগে তার থেকেও যেন কম ব্যথা লাগে। সঙ্ঘে এটাই হয়।

একটা ঘটনার কথা মাননীয় পিঙ্গলেজীর (মোরপন্থ পিঙ্গলে - শ্রীরামমন্দির আন্দোলনের অন্যতম মার্গদর্শক) কাছে শুনেছি।

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যারোহণের সাড়ে তিনশো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে (১৯৭৩-৭৪) স্থানীয় মানুষজন মুম্বাইতে এক সভার আয়োজন করেছিল। ওই অনুষ্ঠানে যিনি সভাপতি ছিলেন, অনুষ্ঠানের শেষে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিতে একজন স্বয়ংসেবক যান। তিনি দেখলেন, সভাপতি মশায় কয়েকবার কিছু বলতে গিয়েও বলছেন না। তাঁর এই দ্বিধার কারণ জিজ্ঞেস করলে সভাপতি মশায় বললেন, 'আচ্ছা, এই অনুষ্ঠানটার পিছনে কি আর এস এস আছে? স্বয়ংসেবকটি যখন জানাল, কয়েকজন স্বয়ংসেবক পরিচালন সমিতিতে রয়েছেন। তখন সভাপতি মশায় বলে উঠলেন, তাই, তাই। লাইন করে জুতো সাজানো দেখেই তাঁর মনে হয়েছিল এটা সঙ্ঘ। বস্তুত এটাই সঙ্ঘ। সঙ্ঘের অনুশাসন।



সঙ্ঘের অনুশাসন ভঙ্গ করলে তাকে যে কোনো শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে এমন নয়, বড়ো জোর তাকে হয়তো কিছুদিন এড়িয়ে যাওয়া হবে। ঠিক যেমন আমাদের পরিবারে হয়। সঙ্ঘের প্রবীণ কার্যকর্তাদের কেউ কেউ তা জানলেও কখনও বলেননি, বা বলবেনও না। কেননা, সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের গণেশ দেবতার মতো হতে বলা হয়— তাঁর কান বড়ো, তাই শুনবে। কিন্তু পেট মোটা। তাই শুনবে, কিন্তু বলবে না। পেট মোটা করবে। আর সত্যিই যদি এজন্য পেটব্যথা করে তবে ঊর্ধ্বতন অধিকারীকেই জানাবে— নীচেও নয়, পাশেও নয়। মালদার ঘনিষ্ঠ এক স্বয়ংসেবক বন্ধু নিজের কিছু কথা জানিয়ে নাগপুরে চিঠি দিয়ে তা জানিয়েছিলেন। সেসময় মাননীয় রজ্জুভাইয়া সরকার্যবাহ। দিল্লিতে তখন এক বৈঠকে গেলে সেই চিঠিটা হাতে দিয়ে প্রান্তের অধিকারীদের ফেরত দিতে বলেছিলেন।

আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ষাটের দশকের শেষের দিকে বর্ধমান বিভাগের প্রচারক তখন শ্যামমোহনদা (দে)। স্থানীয় এক বৈঠক চলার সময় এক স্বয়ংসেবক বড্ড বেশি কথা বলছিল। সামান্য একটু গলার স্বর উঁচু করে কথা বলতে বারণ করা হয়। পরে শ্যামমোহনদা কাজটা ঠিক হয়েছে বলেও পরদিন সেই স্বয়ংসেবকটির বাড়ি যেতে বললেন। বস্তুত এটাই সঙ্ঘ। সঙ্ঘের একটা গান আমরা গাই— 'শুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রেম হমারা / সঙ্ঘকার্য কা আধার হ্যায়।' শ্যামমোহনদার কথা মনে পড়লে শ্যামচাঁদদার কথাও মনে পড়ে। বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির প্রাণভোমরা ছিলেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গে তখন বড়ো কোনো অনুষ্ঠান হলে তার দায়িত্ব শ্যামচাঁদদার ওপরই থাকত।

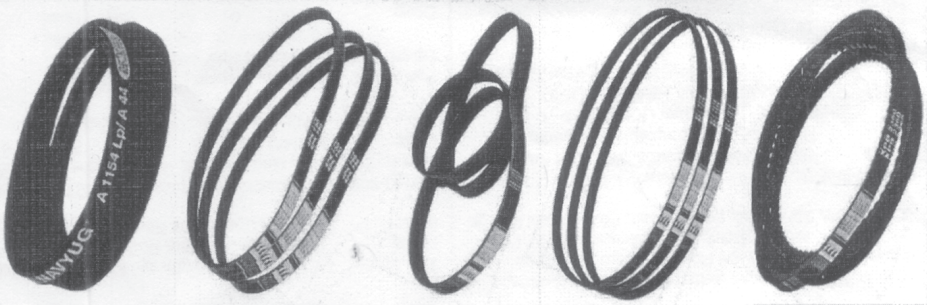
বিগত শতকের সত্তরের দশকের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের বৌদ্ধিক বিভাগের দায়িত্ব থাকার সময় দেখেছি, বৌদ্ধিকের একটা বিষয় থাকত— সঙ্ঘকার্য ঈশ্বরীয়। সেই ৬৯ সালের বৈঠকেই শ্রীগুরুজী প্রার্থনার 'ত্বদীয়ায় কার্যায়' প্রসঙ্গে বলেছিলেন--- শ্রীভগবানের কাজ তিনটি— দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও ধর্মের সংরক্ষণ। সঙ্ঘ যে এই ধর্ম সংরক্ষণ— 'বিধায়াস্য ধর্মস্য সংরক্ষণম'-এরই কাজ করে রাষ্ট্রকে পরমবৈভশালী করতে চায়। সঙ্ঘকার্য ঈশ্বরীয় (ত্বদীয়ায় কার্যায়)— এটা যে শুধু কথার কথা নয়, খুবই 'প্র্যাকটিকাল' তা অনেক স্বয়ংসেবকেরই অনুভূতির গভীরে সঞ্চিত হয়ে আছে। আসলে একটা স্মৃতি আরেকটা স্মৃতিকে উস্‌কে দেয়। প্রার্থনার প্রথম শ্লোকের ভাবার্থ বলতে গিয়ে শ্রীগুরুজী বলেছিলেন, 'মাতৃ ভূমির প্রতি কৃতজ্ঞতা, কৃতজ্ঞতার পরিণাম ভক্তি আর ভক্তির পরিণাম সর্বস্ব সমর্পণ।' বর্তমান পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক মোহনজী এজন্য প্রায়ই বলে থাকেন— ভালো ভাষণ দেওয়া বা লেখালিখি গুণবাচক হলেও সমর্পণই স্বয়ংসেবকত্বের ভিত্তি। শাখায় উপস্থিতি বা সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য শুধু হুইসেল ছাড়া কোনো বাহ্যিক উপকরণ বা মাধ্যম তখনও ছিল না এখনও নেই। তাহলে উপায়? মাননীয় ভাউরাওজী (ভাউরাও দেওরস - সহসরকার্যবাহ ও উত্তরপ্রদেশে সঙ্ঘকার্যের সূচনা করেছেন) বলতেন— বাণী ও ব্যবহার। ব্যক্তিকে দেখেই লোকে শাখায় আসবে। ক্রমে তা বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা, ভাব (সাধনা) এবং পরিণামে রাষ্ট্রের জন্য সর্বস্ব সমর্পণ করবে। হিন্দুরাষ্ট্রের ধারণা ও ঈশ্বরভাবনা সমার্থক। 'মাতা ভূমিঃ পুত্রোহম্ পৃথিব্য।' এই একাত্মতাই সঙ্ঘের রাষ্ট্র দর্শন। পণ্ডিত দীনদয়ালজী উপাধ্যায়ের ভাষায়, 'একাত্মমানবদর্শন।' 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'-দ্দ যুগানুকূল ব্যাখ্যা।

দীনদয়ালজীর কথা যখন উঠলই, তখন তাঁর সান্নিধ্যে একটা প্রসঙ্গের কথা বলি। ১৯৬৫ সালে বর্ধমানে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে দ্বিতীয় বর্ষ শিক্ষা গ্রহণের জন্য গিয়েছি। তখন বিএ সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। দীনদয়ালজী সেই বর্গে এসেছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে কলেজ ছাত্রদের বৈঠকে ছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন--- বঙ্গের তীর্থস্থানগুলির নাম কে কে বলতে পার? আমাদের অনেকেই একে একে বলতে শুরু করলেন— তারকেশ্বর, দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট, বক্রেশ্বর, তারাপীঠ, গৌড়, জল্পেশ ইত্যাদি। আমরা এক একটা নাম

NAVYUG®
COGGED, VEE & POLY BELTS

Environmental Friendly
ISO 14001 : 2015 Certify Unit

NAVYUG



RECOGNISED STAR EXPORT HOUSE BY GOVT. OF INDIA

Manufacturers & Exporters of : Vee, Cogged & Poly Belts
For Industrial & Automotive Application

Winners of Export Excellence Awards from AIRIA & CAPEXIL

Supplies to OEMs, Railways, STUs, ASRTU, BHEL etc.

ACCREDITED
Management System
Certification
MSCB-119

IS : 2494
CM/L NO. 9065679

ISO 9001:2008

NAVYUG (INDIA) LIMITED

G.T. ROAD, BYE-PASS, JALANDHAR-144 009 (PB.)
Phones : 0181-4299900/ 01/ 02/ 2420551
E-mail : info@navyugbelts.com Website : navyugbelts.com

বলছি। আর দীনদয়ালজী বলছেন— আর? আর? তারপরও কেউ কেউ বলল— নবদ্বীপ, গঙ্গাসাগর, কামারপুকুর, জয়রামবাটী। দীনদয়ালজী এবার একটু গম্ভীর। বললেন— ঢাকেশ্বরী, যশোরের কালীবাড়ি, চট্টগ্রামের পাহাড়ে চন্দ্রনাথেশ্বর, চট্টেশ্বরী— পূর্ববঙ্গের এগুলি কি আমাদের তীর্থস্থান নয়? আমরা তো অখণ্ড ভারতের পূজারি। দেশভাগ হয়েছে বলে কি আমরা আমাদের তীর্থস্থানগুলিকে ভুলে যাব? আমরা সবাই নীরব। সবাই মাথা নীচু করে বসে আছি। অখণ্ড ভারত চেতনা জাগরণের শিক্ষা এর থেকে বেশি আর কোথায় পাওয়া যাবে?

আর একটা ঘটনার কথা পড়েছি। দুপুরে খাওয়ার পর হাত-মুখ ধোওয়ার জন্য একজন স্বয়ংসেবক দীনদয়ালজীকে জল দিচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা করল— দীনদয়ালজী, এবারে উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে জনসঙ্ঘ ক'টা আসন জিতবে? দীনদয়ালজী স্বয়ংসেবকটির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন— তুমি এটা সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হিসেবে প্রশ্ন করছ না একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে জিজ্ঞাসা করছ? স্বয়ংসেবকটি যখন বলল সে স্বয়ংসেবক হিসেবেই জিজ্ঞেস করছে, তখন দীনদয়ালজী বললেন— তাহলে সব আসনেই আমরা জিতব। আর একজন সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে জিজ্ঞেস করলে বলব, চব্বিশ-পঁচিশটা আসনে জিতব। বস্তুত, সঙ্ঘের এটাই রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ। দলের লাভ-লোকসান নয়, রাষ্ট্রহিতই লক্ষ্য।

১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে দক্ষিণ কলকাতার গাঁজা পার্কে শ্রীগুরুজী যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা নিয়ে যে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় তার শিরোনাম ছিল 'একাত্মতার আহ্বান'। শ্রীগুরুজীর এটাই শেষ পশ্চিমবঙ্গে আসা। ঁপ্রদীপদা (ঘোষ) পুস্তিকাটির সম্পাদনা করেছিলেন। সঙ্ঘের যুবক স্বয়ংসেবক / প্রচারকরা সম্পর্কের জন্য এই পুস্তকটি নিয়ে বিভিন্ন পরিবারে যাবে। এজন্য সঙ্ঘের একটা সাবধানবাণী চালু আছে। বলা হয়, 'চুলা তক'। সম্পর্কের জন্য রান্নাঘর পর্যন্ত যাবে, কিন্তু চুলায় (উনুনে) ঢুকবে না। প্রচারক পরম্পরা শুরুর প্রথম দিকে এরকম একটা সতর্কতার প্রয়োজন ছিল। এখনও আছে। পূজনীয় বালাসাহেবজীর মুখে এটা শুনেছি। এমনকী বিপরীত পরিস্থিতিতেও মানুষের সঙ্গে কেমন করে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় তার একটা ঘটনার কথা মোরপন্তজীর মুখে শুনেছি। মোরপন্তজী একদিন ট্রেনে যাচ্ছিলেন। পাশে এক মা তার ছোট শিশুকে নিয়ে বসেছিলেন। বাচ্চাটা প্রস্রাব করে ফেললে মোরপন্তজীর জামা-কাপড়ে একটু লাগে। সেই মা তখন বাচ্চাটার গালে টোকা মেরে বলে, ভারি অসভ্য, মামার কাপড় ভিজিয়ে দিলি! ঘটনাটা শুনে হাসতে হাসতে আমাদের পেটে খিল ধরে যাওয়ার জোগাড়। সম্পর্ক স্থাপন কত সহজে করা যায়, তার উদাহরণ দিতে গিয়ে মোরপন্তজী এই ঘটনাটার কথা উল্লেখ করেছিলেন। বস্তুত, রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ কয়েকজনের এক ছাদের তলায় বসবাসই পরিবার। 'সঙ্ঘ পরিবার' বলে যা বলা হয় তার ভাবনা মূলত একই। আত্মীয়তাই মুখ্য, পার্থক্য শুধু ডিগ্রির।

সঙ্ঘের চলার পথ যে কাঁটায় ভরা তা কথার কথা নয়, রূঢ় বাস্তব। সঙ্ঘস্থানকে কেন্দ্র করে দখলদারদের সঙ্গে বিবাদ, হাতাহাতি, মারামারি, সরকারি নানা ধরনের বাধাবিপত্তি, গ্রেপ্তার, কারাবাস, অপহরণ, নির্মমভাবে আঘাত, হত্যা— কী নেই? পশ্চিমবঙ্গ থেকে ত্রিপুরায় সঙ্ঘকাজের জন্য যাওয়া যে চারজন ছিলেন তাঁদের একজন সুধাময় দত্ত। স্বস্তিকার একই ঘরে আমরা দুজনে থাকতাম। দীনেন দে— আমার ভগ্নীপতির (ঁদীপেন দে) সহোদর। সোনারপুরে (বৈকুণ্ঠপুর) শাখা যখন শুরু (১৯৬২) হয়, তখন ওরা দুই ভাই, সহোদর দিলীপ ও সমীর, বাপি (জয়দেব দাস) এবং কয়েকবছর পর জয়ন্ত (বর্তমান ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক) ও তার ভাই অমিত রায়চৌধুরী এবং অপূর্ব ও অমিত (মুখোপাধ্যায়) শাখায় আসতো। যেদিন চারজনের মৃত্যুর খবরটা সরকারিভাবে জানানো হয়— ফোনের ওপারে কান্নায় ভেঙে পড়া দীপেনের কণ্ঠস্বরটা এখনও শুনতে পাই। শুধু শাখা করার অপরাধে সঙ্ঘস্থানেই সুকেশের (মণ্ডল) ভাই প্রশান্তকে হত্যা করা হয়। গত একশো বছরে সারা ভারতে এমন কতজন স্বয়ংসেবক যে আত্মবলিদান দিয়েছেন, বর্তমান প্রজন্মের কতজনই-বা তা জানে?

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের স্বয়ংসেবকদের সহ্য করতে হয়েছিল শুধু উপেক্ষা আর উপহাস। আর যারা তৃতীয় প্রজন্মের স্বয়ংসেবক তাদের বেশিরভাগ সময়টাই বিরোধিতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আর নেই। বাকিরা জীবনের শেষ লগ্নে। এদের কেউ কেউ হয়তো একটু আশার আলো দেখে যেতে পাচ্ছেন— এই যা। যে পশ্চিমবঙ্গে শত শত যুবক নৃশংস অত্যাচার সহ্য করেছেন, কারাদণ্ড ভোগ করেছেন, আত্মবলিদান করছেন— সেই পশ্চিমবঙ্গে আবার জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' সম্পূর্ণ গাওয়া শুরু হয়েছে। হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণ হচ্ছে।

জরুরি অবস্থার বিরোধিতা থেকে রামমন্দির পুনর্নির্মাণ ও ৩৭০ ধারা বিলোপ এবং সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুত্বনিষ্ঠ সরকার গঠনে সঙ্ঘের কী ভূমিকা তা দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। এর পেছনে রয়েছে 'A band of intoxicated workers'। আশির দশকে বহরমপুরে সঙ্ঘের এক প্রাদেশিক শিবিরে তৎকালীন সহ- সরকার্যবাহ যাদবরাওজী যোশী কথাটা বলেছিলেন। ১৯৬৯ সালে সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষের এক চর্চাগটে তাঁর কথা— স্বয়ংসেবকদের এই অদম্য ইচ্ছাশক্তির মূলে রয়েছে 'Divine Discontent' —দৈবিক অতৃপ্তি।

বহরমপুরে সেই আশির দশকে পরপর কয়েকটা শিবির হয়েছে। আজ যে অনুপ্রবেশ নিয়ে এত চর্চা চলছে তার সূচনাপর্ব দেখেছি এই শিবিরে। মোরপন্তজী এই সমস্যার মোকাবিলা সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের করতে হবে বলে জানিয়েছিলেন। প্রচার করা হবে যতটা কাজ হয়েছে ততটাই। সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক মনমোহন রায় ও ডা: সুজিত ধরকে তখন এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পরে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সহযোগী ব্যারিস্টার নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার। পুরনো স্বস্তিকার পাতা উলটালেই এসবের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যাবে। বহরমপুর শিবির নিতান্ত একটা ব্যক্তিগত কারণে স্মরণীয়। সেসময় পূজনীয় বালাসাহেব দেখে বলেছিলেন, 'আঢ্যোঽভিজনবানস্মি....' (গীতা, ১৬।১৫)। এযাবৎ বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগে 'আঢ্য' শব্দটি পড়েছি। কিন্তু তা এত প্রাচীন ও তার

অর্থ যে 'শ্রেষ্ঠ' তা জানতাম না।

পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের এই ধরনের বড়ো শিবিরের পূর্ণতা পেয়েছিল ১৯৯২ সালের ২৪-২৬ জানুয়ারি মাসে কল্যাণী শিবিরে। পশ্চিবঙ্গের স্বয়ংসেবকরাও পারে— এই আত্মবিশ্বাসের সূচনা। আঠারো হাজার পূর্ণ গণবেশধারী স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিল সেই শিবিরে। হ্যাঁ, এটা ঠিকই, সঙ্ঘের শাখায় আসতে অভ্যস্ত এমন স্বয়ংসেবক সবাই নয়। সেই শিবিরে যে পথসঞ্চলন হয়েছিল তা দেখে বালাসাহেব হেসে বলেছিলেন, যেন 'বরাত' (বরযাত্রী) যাচ্ছে।

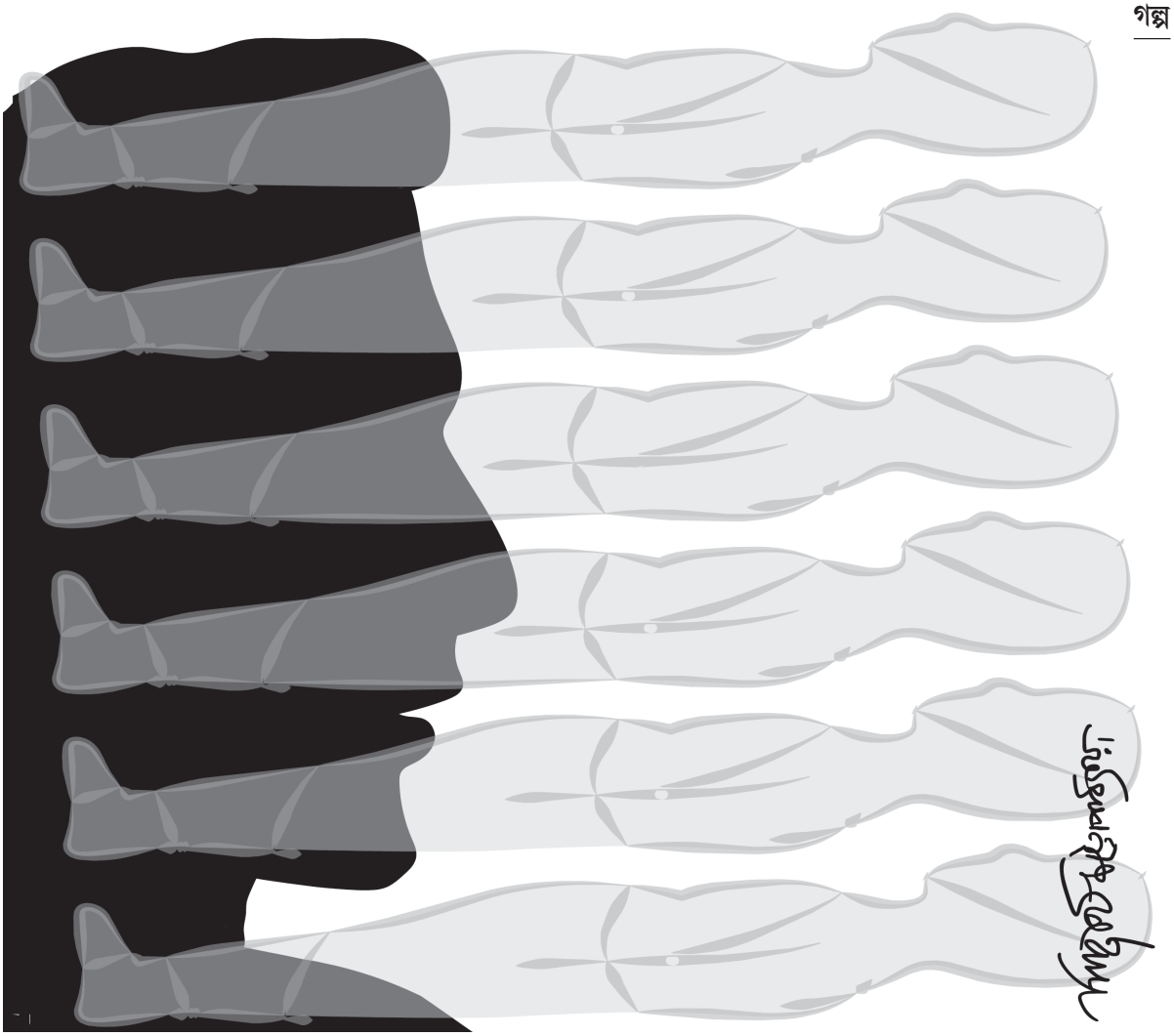
হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করাই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য— এটা কোনো নতুন বিষয় নয়। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডা: হেডগেওয়ার থেকে বর্তমান সরসঙ্ঘচালক পর্যন্ত একথা বলে চলেছেন। 'হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয়ত্ব'— এই রাষ্ট্রীয়তার ধারণা ভৌগোলিক নয়, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক। চিন্তাবিদ চন্দ্রনাথ বসু 'হিন্দুত্ব' শব্দটি তাঁর প্রণীত গ্রন্থের (১৮৯২) শিরোনাম হিসেবে প্রথম ব্যবহার করেন। তাঁর ভাষায়— 'সোঽহং— সেই আমি— এই কথা কহে বলিয়া হিন্দু হিন্দু— এই কথাতে হিন্দুর হিন্দুত্ব'। সঙ্ঘ তাই অনুভবের বিষয়, পুকুরে ডুব না দিলে যেমন তার গভীরতা বোঝা যায় না, সঙ্ঘের শাখার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হলে সঙ্ঘকে জানা-বোঝা সম্ভব নয়। আর তা না হলে সেটা হবে অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো। উপেক্ষা, উপহাস, বিরোধিতার পর আজ সমাজ সঙ্ঘকে গ্রহণ করেছে। সঙ্ঘের এই যে ক্রমবিকাশ তা বহু স্বয়ংসেবকের সাধনার ফল। অথচ বলা হয়— সঙ্ঘের কোনো মুখ নেই। কথাটা যে নেহাত মিথ্যে নয়, তার একটা উদাহরণ নব্বইয়ের দশকে সুদর্শনজী যখন সহ-সরকার্যবাহ তখন শ্রীমানী মার্কেট স্টপেজ থেকে হাফপ্যান্ট পরিহিত তাঁকে চেতলাগামী ১৭ নম্বর বাসে উঠিয়ে দিয়েছি। এটা এক-দুবার নয়, বেশ কয়েকবারই। তাঁকে যারা কাছ থেকে দেখেছেন, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের স্বয়ংসেবকরা, চলার পথের পাথেয় সংগ্রহ করে নিয়েছেন। আদি শঙ্করাচার্য ভাগ্যবান মানুষের যে তিনটি লক্ষণের কথা বলে গেছেন তার একটি হলো 'মহাপুরুষসংশ্রয়'। স্বয়ংসেবকরা সেই ভাগ্যে সৌভাগ্যবান।

তখন ক্লাস ফোর-এ পড়ি। কলকাতায় দর্জিপাড়া শাখায় (ফোয়ারাবাগান) বাচ্চুদা মাঝেমাঝেই শিশুগণের সঙ্গে খেলতে পাঠিয়ে দিতেন। সেটা ১৯৫৬-৫৭ সাল হবে। শুনেছি, সঙ্ঘ এক নলওয়ালা চৌবাচ্চা। জল ঢোকে, কিন্তু বেরোতে পারে না। বাস্তবেও তাই হয়েছে। বয়স আশির কোটায় হলেও মাননীয় কেশবজীর কথা মনে পড়ে। একজন স্বয়ংসেবক বিস্তারক হিসেবে যাবে। ক'দিন কেশব ভবনে আছে। কেশবজী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী করতে এসেছ? সে বলল, বিস্তারক হিসেবে যাব, তাই সঙ্ঘ বুঝতে কয়েকদিন কেশব ভবনে থাকতে বলা হয়েছে। কেশবজী জিজ্ঞেস করলেন, সঙ্ঘ বুঝেছ? স্বয়ংসেবকটি কী উত্তর দেবে তা ভাবতে না পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কেশবজী বললেন, পারবে না। বলতে পারবে না। আমিও পারিনি। বস্তুত, আমরাও কি পেরেছি? দিগন্তরেখার দিকে যতই এগিয়ে যাওয়া যাক না কেন, দিগন্তরেখা যেমন একই রকম দূরে থাকে— সঙ্ঘও তাই। আসলে সঙ্ঘ হচ্ছে সমগ্র হিন্দু সমাজকে সংগঠনের সাধনা। একাত্মতার সাধনা। আনন্দে থাকার সাধনা। □

With Best Compliments from-

KOHINOOR INDIA (P) LIMITED

Basti Bawa Khel, Kapurthala Road,
Jalandhar - 21 (Pb.) India
Phone : (O) 3050052, 3050057, 3050066
Fax : +91-181-3050014
E-mail : nipun@kohinooronline.com
Web : www.kohinooronline.com



মৃত্যুর প্যাকেট

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

রাত ক'টা হলো? মোবাইল ফোন থেকে টাইম দেখল তপন। প্রায় একটা চল্লিশ। শ্মশানে একটা চায়ের দোকান আড়মোড়া ভেঙে খুলছে। ঘুমচোখে কাপে চামচ ঘোরাচ্ছে দোকানদার। চারদিক নিঝুম। সোদপুরের এই শ্মশানটা বড় সুন্দর আর পরিষ্কার। এখানে বাঁক নেওয়া গঙ্গার চেহারাও পরিচ্ছন্ন। গভীর রাতে মাঝগঙ্গায় এসে পড়েছে ওপারের ফ্যাক্টরি শেডের আলো। প্রায় নিস্তরঙ্গ অন্ধকার মাখানো নদীতে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে সেই লাইট। বাতাসে একটা শিরশিরে কাঁপুনি। পুরনো শ্মশানের ভাঙা দেওয়ালে গায়ের জোরে বেড়ে ওঠা অশ্বত্থগাছ বহু যুগের জলহাওয়ায় তাগড়াই হয়ে উঠেছে। হাল্কা হাওয়ায় মাঝে মাঝে দুলে উঠছে পাতাগুলো।

মনীশ ডাক্তারবাবুকে আজ সকালেই নার্সিং হোমে ভর্তি করেছিল বাড়ির লোক। অনেক দিনের ক্যানসার পেশেন্ট। তা বারো বছর তো হবেই। ভালোই ছিলেন, হঠাৎ কী যে হলো! এক ঝটকায় চিকিৎসার ওপারে চলে গেলেন। সকালে ভর্তি। দুপুরে কোনোমতে বেড থেকে তুলে ভেন্টিলেশন। রাত আটটার মধ্যে বেরিয়ে গেল প্রাণবায়ু। মানুষের বেঁচে থাকাটা

দিনে দিনে কী যে অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে! কাচের গাড়ি হাজির হতে রাত প্রায় এগারোটা। তারপর কান্নাকাটি, ফুল-মালা, বাড়ির সামনে একপ্রস্ত ঘুরিয়ে আনা, পাড়াপড়শিদের দীর্ঘশ্বাস।

এক মহিলা বললেন, ডাক্তারবাবু গেলেন চেক আপে, ফিরে এলেন ডেডবডি হয়ে। হায়রে মানুষ! ভিড়ের পেছন থেকে কে যেন বলল, বড্ড ভালোমানুষ ছিলেন আমাদের ডাক্তারবাবু। শরীরে এত দরদ।

শ্মশানটা যতই ছিমছাম হোক, শোনা যায় রাতের দিকে নিশির ডাকের মতো কী যেন একটা হয়। কেউ একা থাকলে তাকে চুম্বকের মতো টানতে থাকে চিকচিকে কালো জলের গঙ্গা। বদনাম আছে এই শ্মশানের। সম্ভবত সেই কারণেই সন্ধে গড়িয়ে গেলে এখানে আর বিশেষ 'বডি' ঢোকে না। রাত বারোটা পঞ্চাশে চারটে গাড়ির সঙ্গে কাচের গাড়িটা যখন শ্মশানে ঢুকল, চারদিক একেবারে শুনশান। ডাক্তারবাবুর দেহ নামানো হলো এক নম্বর চুল্লির সামনের বেদিটায়। অনেক ডাকাডাকির পর ঘাট রেজিস্ট্রার ঘুম থেকে উঠলেন। নিতান্ত অনিচ্ছায় সামনের দরজাটা খুলে দিলেন। তারপর কুলুঙ্গি-মার্কা জানলার সামনে খাতা নিয়ে বসলেন। কোত্থেকে আসছেন? কী হয়েছিল? ডেথ সার্টিফিকেটটা বের করুন ইত্যাকার বাঁধা গতের কথাবার্তা। তবে হ্যাঁ, রেজিস্ট্রারবাবুর হাতের লেখাটি বড় সুন্দর। যদিও লেখালেখি শেষ হওয়ার আগে একবারও বলেননি এক নম্বর চুল্লিটা খারাপ হয়ে পড়ে আছে। বললেন সবশেষে, পেমেন্টটেমেন্ট চুকিয়ে নিয়ে খাতা বন্ধ করে। আপনারা এক কাজ করুন। বডি নিয়ে সামনের রাস্তা ধরে সোজা ওপাশের চুল্লিতে চলে যান। এদিকেরটা কাল বিকেল থেকে দেহ রেখেছে।

— সে কী, এতক্ষণ বলেননি তো! বডি নিয়ে ফের এতখানি ঘুরে যেতে হবে? এ তো আচ্ছা জ্বালাতন!

— মনে ছিল না। কী করা যাবে? আপনারা তো দেখছি অনেকে আছেন। হয়ে যাবে, ঘাবড়াবেন না।

কাচের গাড়ি ছেড়ে দিয়ে অগত্যা সবাইকে কাঁধ দিতেই হলো। ডাক্তারবাবু দীর্ঘদিনের ক্যান্সার পেশেন্ট হলেও শরীরটা সেই অনুপাতে ভাঙেনি। ওজনও বেশ ভালোই। এক নম্বর চুল্লির সামনের বেদি থেকে বডি তুলে নিয়ে, বেশ কয়েক বার ওঠানামা করে একটা দেওয়ালের ফাঁক গলে শ্মশান চত্বরের বারে গিয়ে পড়তে হয়। তারপর হরিধ্বনি দিতে দিতে ওধারের ক্যাম্পাসে ঢুকে, আট-দশটা সিঁড়ি ভেঙে দু নম্বর চুল্লি। বডি নামিয়ে সবাই দম নিচ্ছিল। তখনই পাশে একটা গেট খুলে বেরিয়ে এল সুদর্শন একটি ছেলে। চেহারা সুন্দর তো বটেই, পরনের পোশাকআশাকও বেশ দুরস্ত। এই এলাকার পুরনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অ্যাসিস্ট্যান্ট তপনের দিকে এগিয়ে এসে বলল, ও, আপনারাই পার্টি? ফোন পেলাম আধঘণ্টা আগে। সাইকেল বার করতে যেটুকু টাইম লাগে। পুরুতমশাইয়ের কাজ এখনও তো হয়নি দেখছি। সেরে নিন। দাঁড়ান, আমি ডেকে দিচ্ছি। এখানে চায়ের দোকান দুটো আছে। একটা রাতে খোলে। ভিড় বেশি হলে দু'নম্বরও খোলে। তবে তেমন দরকার হয় না। বডি চুল্লিতে ঢুকে গেলে আপনারা দোকানের রকে গিয়ে বসে পড়বেন। তাহলে পাতাখোরগুলো আর সুবিধা করতে পারবে না। ওদের পয়সা দেবেন না খবরদার। তপন আর ডাক্তারবাবুর ছেলে অরুণাংশু জিজ্ঞেস করল, আপনি কি এখানে কাজ করেন?

হ্যাঁ, আমি লাশ পোড়াই। সারাবছর নাইট ডিউটি করি। দিনের বেলা অন্য লোক, রাতে আমি। টেনশন নেবেন না, সব কাজ সুষ্ঠুমতো হয়ে যাবে। ওয়েট করুন, যাব আর আসব।

আপনার নাম কী ভাই?

সজ্জন সিংহ। পাঞ্জাবি। তবে পাঞ্জাবে কোনদিন যাইনি। কলকাতারই ছেলে।

মিনিট দশেকের মধ্যে পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল সজ্জন। নিন, আপনারা শুরু করে দিন। আমি ওদিকটা গুছিয়ে রাখছি। রাত দুটো বাজে। আর দেরি করা যাবে না।

দক্ষ পুরোহিত বেশি সময় নিলেন না। গঙ্গা থেকে জল নিয়ে আসা হয়েছিল ঘট ভরে। প্রয়াত ডাক্তারবাবুর ছেলে অরুণাংশু ডেডবডির বেদির পাশে ছেতড়ে বসে পড়েছিল। চোখ দুটো টকটকে লাল। পুরুত মশায়ের মন্ত্র পড়া শেষ। এবার শুরু হলো মৃত মানুষটিকে প্রদক্ষিণ করে মুখাগ্নি-পর্ব। ডেড বডিকে ফোকাসে রেখে পুরো অনুষ্ঠানটি ভিডিও বন্দি করছিলেন মনীশ ডাক্তারবাবুর শ্যালক, এলাকার আর এক পরিচিত ডাক্তার অমলকান্তি রায়, সব কাজ সেরে তারপর সবাই মিলে বলহরি—হরিবোল। সজ্জন ততক্ষণে চুল্লি রেডি করে ফেলেছে। বাখারির শয্যায় শায়িত মনীশ ডাক্তারবাবুর দেহটা টানতে টানতে চুল্লির সামনের রেলে এনে ফেলা। চোদ্দ-পনেরোটা মানুষের নড়াচড়া আর হরিধ্বনির কোলাহলের মধ্যেই কখন যেন ধিকিধিকি আগুনের গ্রাসে ঢুকে গেলেন মনীশ ডাক্তার।

এবার কিছুক্ষণের অখণ্ড অবসর। অন্তত পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট। শ্মশান যাত্রীদের হাঁটাচলায় অসীম ক্লান্তি আর রাতজাগা আলস্য। এক নম্বর চুল্লির গা ঘেঁষে একটা পায়ে চলার রাস্তা ঢালু হয়ে গঙ্গার দিকে নেমে গেছে। তার ডানদিকে সাবেক শ্মশান। যেখানে আবহমান কাল কাঠে পোড়ানো হতো মৃতদেহ। এখনও অবাঙ্গালি কোনও বডি এলে কাঠের সন্ধানে এখানে আসে তার বন্ধুরা। সামনের নিশীথ নদীতে কালো পোঁচ দিয়ে গেছে কারা যেন। মাঝগঙ্গায় চিকচিকে আলোয় জোয়ারের টান। সজ্জন নিজের কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখে কখন যেন ঢাল বেয়ে নদীর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। গঙ্গা থেকে জল তুলে নিজের মাথায় ছেটাল। তারপর অভ্যস্ত ভঙ্গিতে কাদাটে ঢাল বেয়ে একেবারে ওপরে। এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকজন। এসেছে তিন গাড়ির তিনজন ড্রাইভার, ডাক্তার অমলকান্তির অ্যাসিস্ট্যান্ট তারাদাসবাবু, মৃত মনীশ ডাক্তারের দু'তিনজন প্রতিবেশী— এমনই আরও কেউ কেউ। সজ্জনকে দেখে অনেকেরই কৌতূহল হচ্ছিল। ছেলেটার

হাবভাব চালচলন কোনোকিছুই শ্মশানের ডোমের মতো নয়। বরং মনে হয় সওদাগরি অফিসের জুনিয়র এক্সিকিউটিভ হলে মানাত ভালো। তপন হাঁক দিলো—সজ্জন, এদিকে একবার এসো তো, তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করি। চা খাবে এক কাপ?

— না না, চা আমি খাই না রাতের বেলা। শরীর খারাপ হয়ে যাবে। আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?

— আমরা আসছি ব্যারাকপুর থেকে। যিনি মারা গেছেন, তিনি একজন ডাক্তারবাবু। ক্যানসার হয়েছিল।

— তাই নাকি? উনি ডাক্তারবাবু ? ডাক্তারবাবুরা মারা গেলে কীরকম যেন লাগে। ওঁরাই মানুষকে বাঁচান কি না।

— আচ্ছা সজ্জন, তুমি কি এই শ্মশানের পারমানেন্ট স্টাফ? আছো কতদিন?

— আরে না না, পারমেন্ট-টারমেন্ট নয়। ক্যাজুয়াল করি। সবটাই রাত্তিরবেলা। দিনের লোকেদের সঙ্গে দেখাই হয় না।

— তুমি এখানে থাকো কোথায়? দিনের বেলায় কী করো? অন্য কোনও কাজ?

— কী আর করব। খাই দাই ঘুমাই। পাড়ার পার্টি অফিসে বসে থাকি। মাঝে মাঝে দালালির কাজ জুটে যায় দুয়েকটা।

— তা কতদিন এখানে কাজ করছ সজ্জন?

— পনেরো-ষোলো বছর হবে। ক্যাজুয়াল কাজ। ইচ্ছে করলে বহুদিন আগেই বড়ো শ্মশানে কাজ নিতে পারতাম। কিন্তু এখানেই আমার সুবিধা। বাসাটা কাছে। বউ-বাচ্চা আছে, মা-বাবা আছে, পুষিয়ে যায়।

অনেকগুলো কথা একটানা বলে একটু দম নিল সজ্জন। কী যেন ভেবে নিল নিজের মনে। তারপর বলল—স্যার, একটা কথা। আপনারা কিন্তু ভাববেন না রাতে কাজ করি বলে পার্টির কাছ থেকে জোর করে পয়সা আদায় করি। ক্যাজুয়াল হলেও সরকারি কাজ, টাকাপয়সা এরা মন্দ দেয় না।

চলে তো যাচ্ছে স্যার। কী বলেন? ভাববেন না। জবরদস্তি আমি করি না। ঘটে করে গঙ্গার জল এনে দেব। সেই জল দিয়ে নাই-কুণ্ডলি ঠাণ্ডা করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবেন। কোনও অসুবিধা নাই। তারপর যা ভালো লাগে, দেবেন।

— আচ্ছা সজ্জন, এই কাজ করতে তোমার ভালো লাগে? রোজ রোজ কত রকমের ডেড বডি আসে। কান্নাকাটি, চ্যাঁচামেচি, হরিধ্বনি, ভালো লাগে এইসব?

—ভালো লাগালাগির কী আছে স্যার, এটা আমার কাজ, সেইভাবে দেখি। পাবলিককে হেল্প করি। মাঝেমাঝে কিছু পার্টি আসে, বহুত হুজ্জতি করে। তখন মনে হয় দুত্তোর ছেড়ে দিই এইসব কাজ। আসলে গরিব ঘরের ছেলে তো, কাজ ছাড়লে খাব কী? ও স্যার, দাঁড়ান দাঁড়ান, চুল্লিতে আজ একটু গড়বড় হয়েছে, হিট ঠিকমত হচ্ছে না। একটু দেখে আসি।

কথা বলতে বলতে থমকে গিয়ে আড়চোখে একবার তপনকে দেখে নিল সজ্জন। চলে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু একে কি ভালোভাবে চলে যাওয়া বলে? রাতের পর রাত মরা মানুষ নিয়ে টানাটানি। কখনও ঠায় বসে থাকা, কখনও থইথই বর্ষায় চুল্লি থেকে গরম হাতা দিয়ে টেনে টেনে সদ্য চলে যাওয়া মানুষের চিতাভস্ম পাত্রবন্দি করা। টাকাপয়সা চাইতে হয় না বিশেষ। সরকারের পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার পর শ্মশানযাত্রীরা নিজেরাই বুদ্ধিমতো সজ্জনকে কয়েকশো টাকা দিয়ে যায়। গবগবিয়ে ধোঁয়া ওঠা ভস্মাধারে শ্মশানযাত্রীদের দিয়ে মাটির কলসি থেকে গঙ্গাজল ঢালা, তারপর সেই চিতাভস্ম বুকজলে নেমে ভাসিয়ে দেওয়া, মাঝগঙ্গার দিকে টিপ করে নাই—কুণ্ডলি ছুঁড়ে দেওয়া— একেবারে বাঁধা গতের কাজ।

সজ্জন চলে যেতেই তপন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল কে কী করছে। ডাক্তার অমলকান্তি প্রথম থেকেই মৃতদেহের ছবি তোলায় ব্যস্ত ছিলেন। মনীশ ডাক্তারবাবুর দেহ ঘিরে যতক্ষণ আচার-অনুষ্ঠান চলছিল, একমনে তিনি সে সব ভিডিয়ো করছিলেন। আর এখন, গভীর রাতের নদীর সামনে দাঁড়িয়ে নানা অ্যাঙ্গেলে ছবিই তুলে যাচ্ছেন। তপন ডাক্তারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, ছেলেটাকে দেখেছেন অমলদা। কেমন যেন অন্যরকম। শ্মশানের ডোম বলে ঠিক বিশ্বাস হয় না।

— হ্যাঁ, তাই দেখছি। আমার মনে হয় ও কিছু একটা পাবে বলে এখানে পড়ে রয়েছে।

— কিছু একটা বলতে? কী পেতে চায় ও?

— সেটাই তো প্রশ্ন। দেখা যাক কী বলে ফিরে এসে।

প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিট পরে সজ্জন ফিরে এল গঙ্গার ধারে। বলল, চুল্লির চাতালের কাছে অস্থি রেখেছি। আপনারা যাঁরা জল দিতে চান, এই ঢালু পথ দিয়ে নদীতে চলে যান। আর ডাক্তারবাবু স্যার, সব হয়ে গেলে একটু টাইম দেবেন। কথা আছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সব মিটে গেল। চারপাশে কেমন একটা রিক্ততা। এই এক অদ্ভুত ব্যাপার। খানিক আগে যে মানুষটাকে যত্ন করে কপালে চন্দন পরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সর্বাঙ্গে নামাবলী জড়িয়ে পাটভাঙ্গা ধুতি-চাদর পরে যে শুয়েছিল সকলের মাঝে, চুল্লিতে ঢুকতে না ঢুকতেই সে হয়ে যায় আগুনের খাদ্য, অবশেষে পরিত্যক্ত অঙ্গার। দু' নম্বর চুল্লির বাইরের চাতালে এক কোণ ঘেঁষে চিতাভস্মের পাত্রটা রাখা ছিল। সবাই একে একে গিয়ে জল দিচ্ছে। প্রতিবার জল পড়ার সাথে সাথেই ধোঁয়া উঠছে ভুস ভুস করে। সেই ধোঁয়ার মধ্যে দিয়েই দেখা যাচ্ছে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার চিকচিকে কালো জল। এক রহস্যময় অনন্ত প্রবাহ। নিশুতি রাতে যে রহস্য আরও বেড়ে গিয়ে জেগে থাকা মানুষজনকে আক্রান্ত করে। ঘণ্টা দুয়েক ধরে অমলকান্তি প্রায় নেশাগ্রস্তের মতো মৃতদেহের ছবি তুলে যাচ্ছিলেন। সজ্জন ডাক্তারবাবুর কাছে এসে বলল, স্যার ডেডবডি তো আর নেই। এখনও ছবি তুলছেন কেন? চোখ থেকে ক্যামেরাটা সরিয়ে বিষণ্ণ হাসলেন অমলকান্তি— অনেক ছবি তুলছি, না? এবার থামব।

আসলে জামাইবাবু যে আমার বন্ধু ছিলেন। উনি চলে যাচ্ছেন, কী করি বলো? ডাক্তারি করছি এত বছর। তবু জীবনমৃত্যুর তফাতটা আজও মানতে পারি না। সজ্জন, এটা রাখো। বলে পকেটে হাত দিয়ে সজ্জনের দিকে এগিয়ে গেলেন অমলকান্তি। পাঁচশো টাকার দুটো নোট।

এ কী, এত দিচ্ছেন কেন? সজ্জন প্রতিবাদ করল। আপনাদের এখন অনেক খরচ। একটা পাঁচশো বাঁ পকেটে ঢুকিয়ে বাকিটা বাড়িয়ে দিল ডাক্তারের দিকে। ডাক্তার ফেরত নিলেন না। সজ্জনের হাতটা ঠেলে দিয়ে বললেন— কী বলবে বলছিলে, সেটাই বলো।

স্যার, আমাকে একটা কাজ দেবেন? আপনার তো অনেক কানেকশন। সারা জীবন কেনা গোলাম হয়ে থাকব স্যার। আমার জীবনটাই পাল্টে যাবে।

—জীবন পাল্টে যাবে? এমন মনে হচ্ছে তোমার? কী কাজ, বলো?

—স্যার, শুকনো লাশের প্যাকেট। দুশো ছয়খানা হাড়। মানে গোটা একটা কঙ্কাল। একটাও কম হলে চলবে না।

অমলকান্তি হতভম্ব হয়ে খানিকক্ষণ সজ্জনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

— তুমি ঠিক কী বলছ বুঝতে পারছি না। ওই প্যাকেট দিয়ে কী হয়? কারা এ সব করে?

— স্যার, কিছু মনে করবেন না। আপনারা যখন ডাক্তারি পড়তেন, তখন বোধহয় এ সব ছিল না।

এখনকার বাবা-মায়েরা ছেলেকে ডাক্তারি পড়াতে গিয়ে জান কবুল করে দেয়। একটা প্যাকেট মানে তিরিশ হাজার টাকা। হ্যাঁ স্যার, কড়কড়ে তিরিশ হাজার। শ্মশানের ডোমেরা এ সবের নাগাল পায় না।। পায় মর্গের ডোমেরা। ওরা বাইরের লোককে ভিড়তেই দেয় না।

— কিন্তু এ সব তো বেআইনি কাজ। পুলিশ ধরবে, জেল হবে। এ তো বডি পাচার!

— স্যার, সেই জন্যেই তো আপনাকে বলছি। আপনাদের তো স্যার, অনেক লম্বা হাত। অমলকান্তি হাঁটতে শুরু করলেন। তারপর হাঁটা থামিয়ে পকেট থেকে বার করলেন অনেকগুলো পাঁচশো টাকার নোট।

— সজ্জন, এটা রাখো। না বোলো না। জামাইবাবুর সৎকারের কাজে আমরা সকলেই খুশি হয়েছি। কিন্তু মনে রেখো সজ্জন, জামাইবাবু শুধু আমার আত্মীয় নন, আমার খুব বড়ো বন্ধু ছিলেন। বন্ধু কখনও লাশ হয় না। আমার কাছে চিকিৎসা করতে এসে অনেকেই মারা গেছেন, ডেথ সার্টিফিকেট দিতে হয়েছে, আমি কিন্তু কোনোদিন তাঁদের লাশ ভাবিনি। যিনি এতদিন আমারই কাছেপিঠে কোথাও ছিলেন, আমার চেম্বারে আসতেন, গল্প করতেন, বাজারেও দেখা হতো, তিনি তো আমারই আপনজন।

কাছে পিঠেই কোথাও আছেন এখনও। সজ্জন, একটা কথা বলি শোনো, মানুষ কিন্তু মানুষই থাকে, লাশ হয় না। তুমি জীবনে আরও অনেক ভালো সুযোগ পাবে। কিন্তু এই নোংরা লাইনে ঢুকো না। আমার অনুরোধটা রেখো, তোমার ভালো হবে।

—স্যার, স্যার একটা কথা। আমি অনেকদিন ধরে ওয়েট করছি, ঠিকঠাক লোক খোঁজার চেষ্টা করছি। পাইনি স্যার, কাউকে পাইনি। কিন্তু আপনাকে দেখেই বুঝেছি, ঠিক মানুষটা এসে গেছেন। যদি একটু দেখেন স্যার, আমার জীবনটাই ঘুরে যাবে। আপনি একটু দয়া করলে কাজটা হয়ে যাবে স্যার, হবেই হবে।

অমলকান্তিরা গাড়িতে উঠলেন। ভোর হতে আর বেশি বাকি নেই। একে একে বেরিয়ে গেল চারটে গাড়ি। হাত নাড়লেন অমলকান্তি, কোনও কথা বললেন না। চায়ের দোকানে গ্যাসের উনুনে শোঁ-শোঁ শব্দ। দুটো কুকুর ছেঁড়া পাঁউরুটির টুকরো টানাটানি করছে। দোকানের রকে বসছিল সজ্জন, অতি কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে অবসন্ন পায়ে এগিয়ে গেল চিতাভস্মের দিকে। সকলে হাতে হাতে জল দেওয়ার পরেও ভস্মাধার থেকে কুণ্ডলি পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছিল। ছাই আর জলে মাখামাখি পাত্রটা হাতে নিয়ে ঢালু রাস্তা বেয়ে গঙ্গার দিকে নেমে গেল সজ্জন। এমন সময়ে আবার গাড়ির আওয়াজ। আর একটা পার্টি ঢুকছে। ছোটো ম্যাটাডোরে চাপিয়ে লাশ নিয়ে আসছে অন্য এক দল। পুরো দেহটা ব্যান্ডেজে মোড়া।

অ্যাকসিডেন্ট কেস।

পুবের আকাশ লাল হয়ে আসছে। হু হু হাওয়া। হাতে এখনও অনেক কাজ। গোটা একটা বডি পোড়াতে হবে। নাভি-কুণ্ডলি খুঁজে বার করতে হবে।

বড্ড ক্লান্ত লাগছে। বাড়ি ফিরতে হবে। একটু ঘুমোতে পারলে ভালো হয়। নদীর দিকে আরও তাড়াতাড়ি পা চালাল সজ্জন। □

With Best Compliments from-

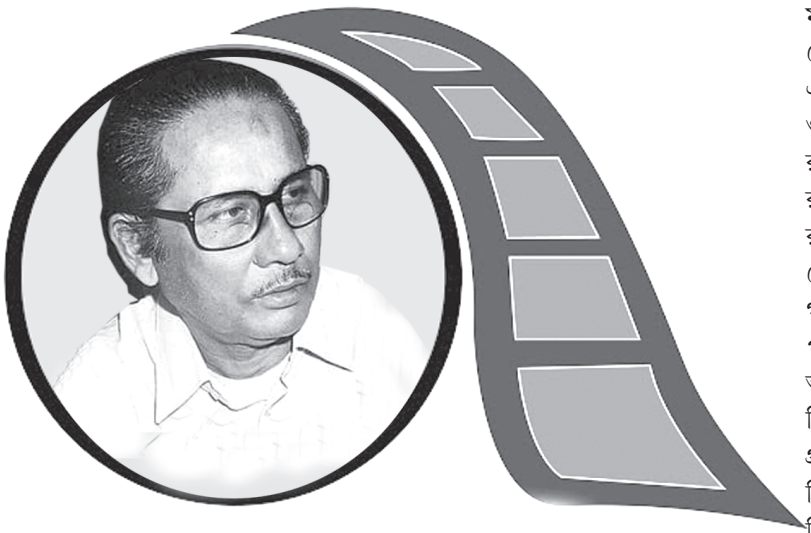
Laghu Udyog Bharati

All India Organisation in the Service of small scale industries

ADVOCATE ARVIND DHUMAL

All India Vice President
Co-ordinator Punjab, Chandigarh, J/K & Laddakh





বলয়গ্রাসে রাজেন তরফদার

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

ঋত্বিক ঘটক তাঁর চলচ্চিত্রীয় জীবনকালে সাকুল্যে ৯টি ছবি পরিচালনা করেছেন। আজ ভারতীয় তথা বিশ্ব চলচ্চিত্রের পরিসরে তাঁর একটি অনুপেক্ষণীয় উপস্থিতি বিদ্যমান। তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা ছিল অবিভক্ত বঙ্গের মাঠ-ঘাট, নদ-নদী ও মানুষজনকে ঘিরে। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে মানুষ 'মেঘে ঢাকা তারা'র নাম সর্বাধিক আলোচনায় আসে। তাঁর ছবিটির ছায়ায় আবার একটি মেঘে ঢাকা তারা প্রায় তাঁর জীবনানুগ ভাষ্য হিসেবে নির্মাণ হয়েছে। প্রসঙ্গত, বহু চলচ্চিত্রই মানুষের অপরিমেয় আকর্ষণ, তার বিষয়বস্তু ও নির্মাণ কুশলতায় একটি সময়কালের পর পুনর্নির্মিত হয়েছে। এমনকী তারা দেশের বিভিন্ন ভাষার গণ্ডিকেও অনায়াসে অতিক্রম করেছে। দেবদাস, পরিণীতা ইত্যাদি বহু উদাহরণ আছে। কিন্তু এখানে বিষয়বস্তু ছবিটির আদিকাণ্ড অর্থাৎ কাহিনির অপ্রতিরোধ্যতাগুলি। ঋত্বিকবাবুর ক্ষেত্রে সদ্য একটি নাটক 'মেঘে ঢাকা ঋত্বিক'ও মঞ্চস্থ হয়ে গেল। তাঁকে নিয়ে যথাযথ কারণেই কৌতূহল, চর্চা সীমাহীন যা তিনি ৫০ বছরের এলোমেলো জীবনকালে কোনোদিনই পাননি। ওই একই সময়ে ১৯১৭ সালে পূর্ববঙ্গের রাজশাহীতে জন্মেছিলেন আর একজন বাঙ্গালি রাজেন তরফদার। তিনি ম্যাট্রিকুলেশন অবধি রাজশাহীতেই পড়াশোনা করেন। তারপর দেশভাগের আগেই কলকাতায় এসে গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টস থেকে ডিগ্রি পান পপুলার আর্টস-এর। সেই সব দিনকাল আজকের মতো ছিল না। সঙ্গে-সঙ্গেই সম্ভ্রান্ত বিজ্ঞাপন সংস্থায় De Walter Thomson গ্রাফিক ডিজাইনারের চাকরি পান। যেমন জি.ডি ফিমার কোম্পানিতে প্রায় একই ধরনের পেশায় ছিলেন সত্যজিৎ রায়।

চলচ্চিত্র নির্মাণ ও পরিচালনার বিষয়টিকে একটু বিশ্লিষ্টভাবে দেখলে পরিষ্কার হয় বহু প্রতিভাবান মানুষই নিরাপদ জীবনযাত্রায় থিতু হওয়ার নিরাপত্তাকে পরিত্যাগ করে 'মারের সাগর পাড়ি দেব গো' বলে চিত্র নির্মাণের তরঙ্গসঙ্কুল পথ ধরেছেন। সকলেই জানেন Performing Arts-এর এই ধারাটি সর্বাপেক্ষা কঠিন, বিশেষ করে যদি পরিচালক চিন্তাশীলতার পরিস্ফুটন ঘটিয়ে দীর্ঘস্থায়ী কোনো অভিঘাত দর্শক চিত্তে রেখে যেতে চান বা আরও সহজ কথায়—মানুষ ও সমাজের স্মৃতিবন্দি হয়ে থাকার ইচ্ছায় প্রেরিত হন। রাজেনবাবু আর্ট কলেজে পড়ার সূত্রে অসাধারণ স্কেচ করতেন। সেই দক্ষতা ব্যবহার করে তিনি কাটিয়ে দিতে পারতেন। ৫০-এর দশকের নিম টুথপেস্ট ও নিমসাবানের

বিজ্ঞাপন তাঁরই হাতের। কিন্তু চলচ্চিত্র নির্মাণ তো বই লেখা, ছবি আঁকার বা অন্য শিল্পচর্চার মতো একার চেষ্টায় হয় না। এ-এক যূথবদ্ধ জটিল পথ। প্রথমত, গল্প নির্বাচন, তার চিত্রনাট্য নির্মাণ। এই দু'টি কাজ অনেক সময় পরিচালক নিজেই সম্পাদন করতে পারেন। এরপর সঙ্গীত, আবহ সঙ্গীত, অভিনেতা অভিনেত্রী নির্বাচন, আলোকচিত্রী, স্টুডিয়ো ভাড়া, ছবির সম্পাদনা এগুলির খরচ মেটাতে প্রযোজক লাগে এবং তার অনুসন্ধান এবং সর্বোপরি ছবি সমাপ্ত হলে সেটি কোন কোন প্রেক্ষাগৃহগুলিতে (এসব ৬০–৭০ দশকের Mall হীন সময়ের কথা) মুক্তি পেয়ে দর্শক আশীর্বাদ পাবে তার অনুসন্ধান। সমগ্র ইউনিটকে সফলভাবে একাঙ্গী করা দুরূহ কাজ। কিন্তু রাজেনবাবু ১৯৫৭ সালের আগেই চাকরিবাকরি ছেড়ে তাঁর প্রথম চলচ্চিত্রীয় আত্মপ্রকাশ ঘটালেন 'অন্তরীক্ষ' ছবি দিয়ে। ছবিটির কাহিনি অভিনেতা তুলসী লাহিড়ী ও পরিচালক রাজেনবাবু। আশ্চর্য যে, এই ছবিটিতে অত্যন্ত জটিল কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন নির্মম গ্রামীণ বঙ্গের বাস্তব পরিস্থিতিকে সটান পর্দায় তুলে এনেছিলেন পরিচালক। প্রথম ছবিতেই তিনি সমালোচকদের সম্ভ্রম আদায়ে সক্ষম হন। তৎকালীন গ্রামীণ বাঙ্গালির সামাজিক জীবনে জমিদার ও সাধারণ শ্রেণী তুমুল বিভাজন বিদ্যমান। এই ছবিতে 'গৌরীদান' প্রথার কথা রয়েছে। তা যেমন করে একটি সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত নারীর ছাপোষা জীবনকে ছারখার করে দিচ্ছে তার মর্মান্তিক দৃশ্যপটগুলি আবেগের তীব্রতায় ও আলোছায়ার কারুকাজে মানুষের মনে ওলট পালট ঘটিয়ে দিয়েছিল। সঙ্গে উঠে এসেছিল গ্রাম-বাঙ্গলার প্রাণবন্ত হোলিখেলায় শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের একেবারে মাটির গন্ধনিঃসৃত উৎসব উদ্‌যাপন যা খুব বেশি চলচ্চিত্রে দেখা যায়নি। এখানেই তরুণীটিকে সামান্য ফাগ ছোঁয়ানো ও তার লজ্জাবনত দৃষ্টিতে বেশ বোঝা যায় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক সময়ে বাঙ্গালিয়ানার একটি প্রায় তথ্যচিত্রের মতো ডিটেল যাকে বলে নিবিড় পর্যবেক্ষণ। ১৯৫৭ সালে প্রখ্যাত অভিনেত্রী সন্ধ্যা রায়কে তিনি 'অন্তরীক্ষ' ছবিতে প্রথম সুযোগ দেন।

রাজেন তরফদারের চলচ্চিত্রজীবনে বরাবরের দায়বদ্ধতা ও আকর্ষণ ছিল জন্মভূমির নদীমাতৃক প্রকৃতির ওপর। স্থলভাগের সমাজ ও উপকূল নির্ভর সম্প্রদায় উভয়ের উপরেই এই ব্যবস্থার প্রভাব কখনও সমন্বয়কারী কখনও দ্বন্দ্বাত্মক।

তাঁর নদীনির্ভর তিনটি ছবি (১) গঙ্গা (১৯৬০), (২) পালঙ্ক (১৯৭৫) ভারত-বাংলাদেশ যৌথ প্রযোজনা। (৩) নাগপাশ (১৯৮৭) পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রযোজিত ছবিগুলি তৈরি হয়েছিল বিপদসঙ্কুল গোসাবা ও সুন্দরবন অঞ্চলে। বিপুল ঝুঁকিপূর্ণ ক্রেনের ওপর থেকে নেওয়া সট সেই অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ ক্যামেরাকে স্থির রাখা অত্যন্ত কঠিন (পরিচালক গৌতম ঘোষ)। গঙ্গা ছবির ফোটোগ্রাফার প্রখ্যাত দীনেন গুপ্তর দক্ষিণেশ্বর সেতু থেকে গঙ্গায় পড়ে গিয়ে প্রায় প্রাণসংশয় হবার উপক্রম হয়েছিল। এখানেই ছিল বাংলা ছায়াছবির সেই ঐতিহাসিক গানটি নির্মলেন্দু চৌধুরীর 'আমায় ডুবাইলি রে আমায় ভাসাইলি রে অকূল দরিয়ার বুঝি কূল নাইরে'। গানটির তীব্র আবেদন ও মধুরতা মানুষকে চিরকালীন ভাবেই ভাসিয়ে দিয়েছিল। সদ্য ইউটিউবে দেখলাম টাকার অঙ্কে একেবারে দিকপাল সব বহুমূল্য তারকারা শ্রেয়া ঘোষালের লাস্যময় দেহ প্রদর্শনকে তুচ্ছ করে গানটির মূর্চ্ছনায় তন্ময় হয়ে যাচ্ছেন। এরই নাম কালোত্তীর্ণতা। এই ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন দুই চৌধুরী —সলিল ও নির্মলেন্দু। একেবারে চটুল ও ভিন্ন স্বাদের গ্রাম-বাঙ্গলার পল্লী মানুষের আবেগ ভরা। 'ইচ্ছা করে ও পরানটারে গামছা দিয়া বাঁধি' হাসির তুফান তুলে দেয়। নদীর উপকূলের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনের কড়া ও মর্মভেদী ভালবাসাকে জীবন্ত করতে তিনি কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলিতে দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ও ঋজু মানসিকতার প্রতিফলন সম্ভাবনায় অভিনেতাদের এনেছিলেন। গঙ্গায় নিরঞ্জন রায়, অন্তরীক্ষে 'প্রবীর কুমার', নাগপাশে সুমন্ত মুখার্জিরা জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়কৃতি দেখিয়ে গেছেন। একই সঙ্গে বাঙ্গালির দেহসৌষ্ঠবের তেজোদৃপ্ততা সেখানে নজরকাড়া।

গঙ্গা ছবির কাহিনিকার ছিলেন তুমুল জনপ্রিয় সমরেশ বসু। ত্রুটিহীন ও মানবিক দলিল হিসেবে ছবির নির্মাণে কোনো ফাঁক না রাখতে তিনি বহুবার সমরেশ বসুকে ছবির শুটিঙের খণ্ডচিত্র দেখাতেন। গঙ্গার জন্য ৩ হাজার ফুট শট নেওয়া হয়েছিল। বম্বে থেকে এনেছিলেন প্রখ্যাত সম্পাদক ও পরিচালক হৃষীকেশ মুখার্জিকে। ছবিটির নির্মাণ সময় ছিল ৬ বছর। তিনি বলেছিলেন যত শট কাটা হলো সেগুলি ফেলা যাবে না এমন নিখুঁত শটগুলি দিয়ে প্রয়োজনে গঙ্গার ওপর তথ্যচিত্র করে নেওয়া যাবে। হ্যাঁ, দিনে ১৯ ঘণ্টার প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও আজকের বাঙ্গালি 'অস্মিতার' বিস্ফোরণ ঘটানো গঙ্গা রাজেনবাবুকে দর্শকরা ভালোবাসায় ধন্য করে দিয়েছিল। রাজেনবাবুর নদীমাতৃক তিনটি ছবিতে 'সোনার বাঙ্গলা'-কে খোঁজার একটি আকুলতা ছুঁয়ে রয়েছে। এমনই সব হারানো বাঙ্গালি গ্রামীণ জীবনের অনুষঙ্গ ছড়িয়ে রয়েছে প্রতিটি ফ্রেমে। প্রাচীন লোকগান 'আধিরাতে রাম-সীতার বিবাহক্ষণে আধা করি সুতা ৭ পাক দিলা' (সাত পাকে বাঁধা হলো)।

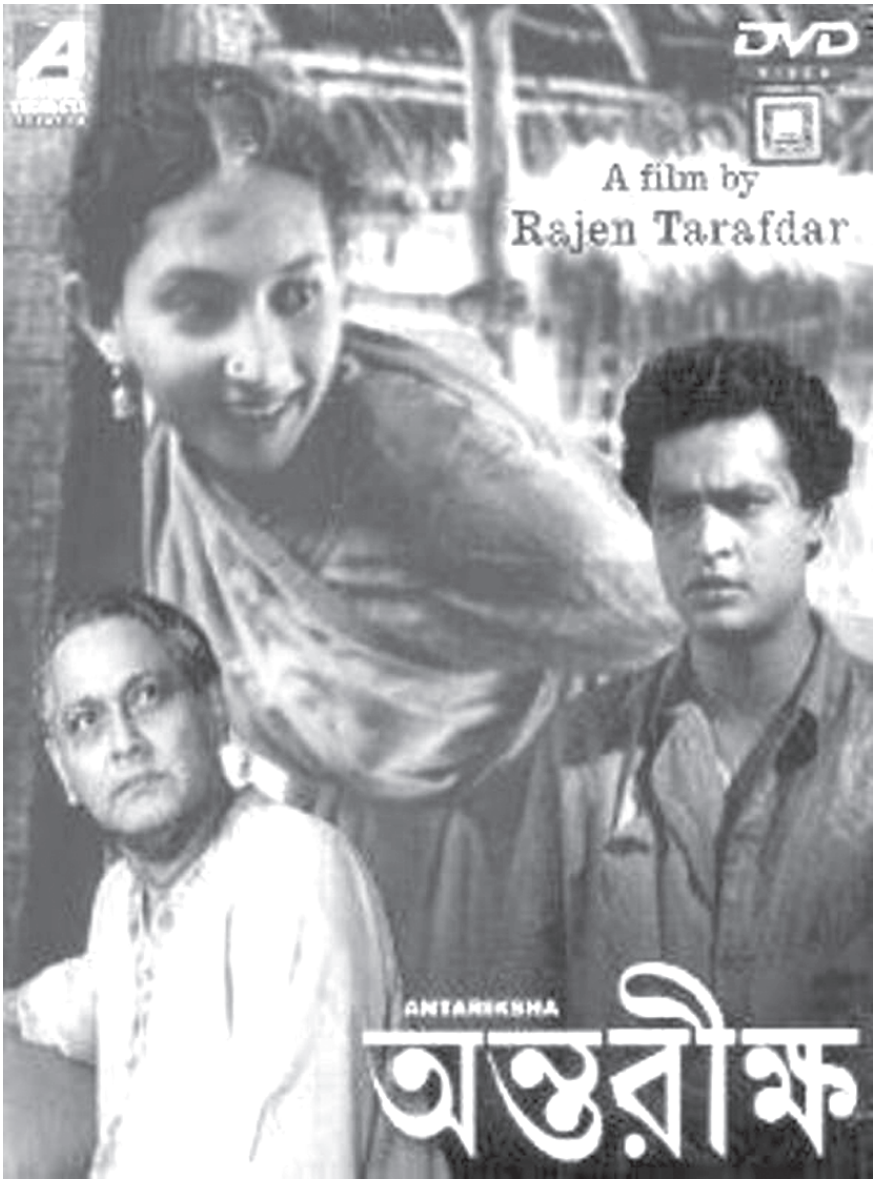
'তিতাস একটি নদীর নাম' লিখে অদ্বৈত মল্লবর্মন অমর হয়ে গেছেন। ঋত্বিক তাকে 'ডবল ডবল' চাকরির মতো অক্ষয় অমরত্ব দিয়েছেন। রাজেনবাবুরও তেমন দাবিদার হওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে।

Trackon
SWIFT . SAFE . SURE
DOMESTIC & INTERNATIONAL COURIER SERVICES
AUTHORISED FRANCHISEE:
SSP ENTERPRISE
GSTIN : 19BMAPS3805A1ZD
Dashadrone Super Market, Shop No - 48,
Kolkata - 136, Near : Rajarhat Township SBI Bank
9681889939
sudipta.saha2010@gmail.com

INTERNATIONAL SERVICES :
DHL BLUE DART
FedEx Corporation
ups
aramex

''আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালবেসে, জলঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এই সবুজ করুণ ডাঙায়,''...

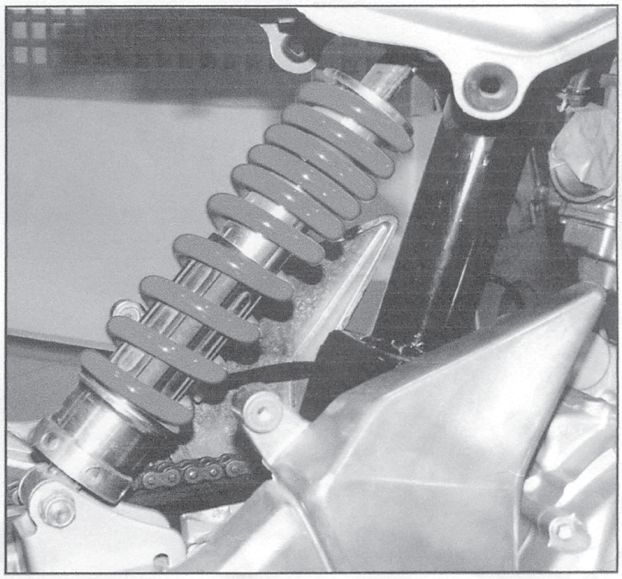
জীবনানন্দের এই অবিস্মরণীয় আর্তিকেই যেন দৃশ্যমানতায় সারিবদ্ধ নৌকায় মৎস্যজীবীদের জীবিকার সন্ধানে গৃহ নিষ্ক্রমণের প্রাক্কালে সম্মিলিত শঙ্খধ্বনি, গঙ্গা প্রণামের দৃশ্য হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া আবেগঘন ভালবাসার প্রতিফলন। বাঙ্গালি চিরকাল মাছ খেয়ে গেছে কিন্তু জীবন বাজি রাখা 'ইলিশ জেলেদের' সে কখনো দেখেনি। বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়া চাচার সমস্ত শরীর ক্রমাগত জলোচ্ছ্বাসে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে গঙ্গার বুকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মর্মন্তুদ আর্তনাদ চলচ্চিত্রের মহাফেজখানায় রাখা আছে। National Film Heritage Mission যা শিবেন্দ্র সিংহ দুঙ্গারপুরের তত্ত্বাবধানে International Federation of Film Archieve-এর অন্তর্গত সেখানে সংগৃহীত রয়েছে।



১৯৬০ সালের দিল্লিতে আয়োজিত চলচ্চিত্র উৎসবে 'গঙ্গা' শ্রেষ্ঠ ছবির শিরোপা পায়। কাকার ভূমিকায় জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় অনবদ্য চরিত্ররূপ দেন। ছবিটি সে বছর ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবেও প্রদর্শিত হয়েছিল। এরপর রাজেনবাবুর অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ 'পালঙ্ক' (১৯৭৫) নিয়ে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রখ্যাত গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের একই নামের গল্পটি দেশভাগের ও তৎপরবর্তী টানাপোড়েনের সময়কার। ছবিটির কেন্দ্রীয় চরিত্র একটি আপাত প্রাণহীন 'পালঙ্ক' যেটি আগেকার সময়ের নির্মাণ সৌকর্যের মনোহারী নিদর্শন। এটি তৎকালীন পলায়নপরতায় বাধ্য হিন্দু জনগোষ্ঠীর যে বহিরাগত হয়ে যাওয়ার অনুভূতির জন্ম হয়েছিল তাই আজ রক্তক্ষয়ী হারিয়ে যাওয়ার সহৃদয় করুণ আবর্তে এসে পড়েছে। উল্লেখ্য, পালঙ্কের সহৃদয় জমিদারের বিশাল ভদ্রাসন, আসবাব সবই ছবির সপ্রাণ চরিত্র। জমিদার কিন্তু সাধারণ ধুতি-চাদরের আভরণে কাঁধে একটি গামছা নিয়ে নির্ভেজাল মমতায় পালঙ্কটিকে সদা চাকচিক্যময় করে রাখতে তৎপর। কারও সাহায্য নেন না। বৃদ্ধের জীবনের সঙ্গে মুসলমান সমাজের মকবুল ওতপ্রতোভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে। কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশ ছেড়ে যাওয়া হিন্দুর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হস্তগত করার লিপ্সা তখন থেকেই ক্রমবর্ধমান যা সমান উগ্রতায় আজও হিন্দুদের বিতাড়িত করে চলেছে। তৎকালীন ছিন্নভিন্ন সময়ের অর্থনৈতিক আবেগ, তাড়না ও ধর্মীয় ভেদাভেদ রাজেনবাবু নিপুণ চলচ্চিত্র নির্মাণ কুশলতায় তুলে এনেছেন। রাজেনবাবুর সেই দেশভাগজনিত দুরদৃষ্টি ও বাংলাদেশি (পাকিস্তানি) হিন্দুর ক্রমিক দুর্দশার পরিণতির দিকেই সমকালীন কোনো চিত্র নির্মাতাই নজর দেননি বা দিতে অজানিত কারণে কুণ্ঠিত ছিলেন। অথচ তাঁদের অধিকাংশই শেকড় ছেঁড়া অবিভক্ত বঙ্গবাসী। ছবিটি ১৯৭৫ সালে মুক্তিযুদ্ধের পরে নির্মিত হলেও ছবির পটভূমি ছিল স্বাধীনতা উত্তর-পূর্ব পাকিস্তান। তিনি নির্মাণপর্ব নিয়ে লেখক নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করতেন যাতে বিশ্বাসযোগ্যতা না টাল খায়। নৌকায় বসা জমিদার ধলাকর্তাকে (উৎপল দত্ত) সঙ্গী মকবুল দেখাচ্ছেন ''ওই দ্যাখেন কর্তা, ঘোষবাড়ির পালঙ্ক ভারতে চলে যাচ্ছে। ওরা সব দ্যাশ ছাড়ছে

MUNJAL SHOWA

Munjal Showa Ltd. is the largest manufacturer of Shock Absorbers, Front Forks, Struts (Gas Charged and Conventional) and Gas Springs for all the leading OEM's in 2 Wheeler/4 Wheeler Industry in the Country. Manufactured Products conform to strict its standard for Quality and Safety. Company's Products enjoy reputation for Smooth, Comfortable, Long-Lasting, Reliable and Safe Ride. The Company is QS 9000, TS – 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 and TPM Certified Company. MSL has technical and financial Collaboration with Showa Corporation Japan.



TPM Certified Company

ISO / TS - 16949 – 2002 Certified

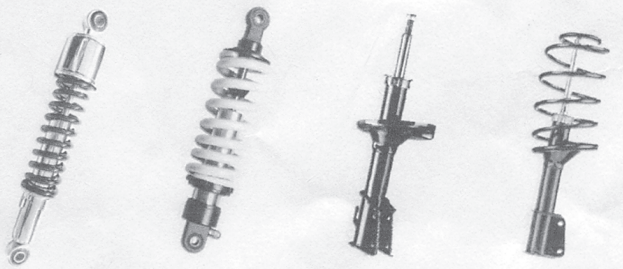
ISO - 14001 & OHSAS – 18001 Certified

Our prestigious Client List :

- Hero MotoCorp Ltd.
- Maruti Suzuki India Ltd.
- Honda Cars India Ltd.
- Honda Motorcycle & Scooter India (P) Ltd.
- India Yamaha Motor Pvt. Ltd.

Our Products

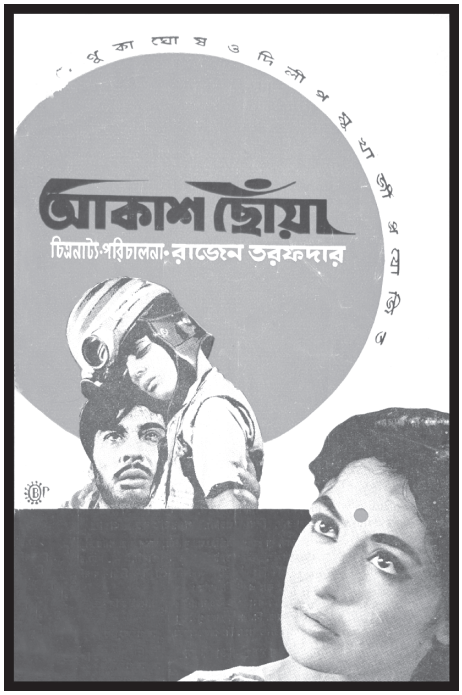
- Struts/Gas Struts
- Shock Absorbers
- Front Forks; and
- Gas Springs



MUNJAL SHOWA LTD.

• Plot No. 9 – 11, Maruti Industrial Area, Gurgaon. Tel. No. : 0124 – 2341001, 4783000, 4783100
• Plot. No. 26 E & F, Sector – 3, Manesar, Gurgaon Tel. No. : 0124 – 4783000, 4783100
• Plot No.1, Industrial Park – II, Village Salempur, Mehdood – Haridwar, Uttarakhand Tel. No. : 0124–4783000, 4783100

যে।" পালঙ্কের খণ্ড অংশগুলি তখন আসন্ন ভবিষ্যৎ দেশত্যাগীদের একটি মৌন মিছিলের কল্পিত প্রতীক হয়ে ওঠে। এই সমাপতন সহজ করে দেয় সিনেমার ফোটোগ্রাফি, ক্যামেরা ও লেন্সের প্রতিস্থাপন ও পরিচালকের অন্তর্দৃষ্টি। সমগ্র দৃশ্যায়নটিকে চাক্ষুষ বিষয়বস্তুর অন্তরালে থাকা মানুষের ভাবনালোকে পৌঁছে দেওয়ার এই মুনশিয়ানা করায়ত্ত ছিল রাজেনবাবুর।



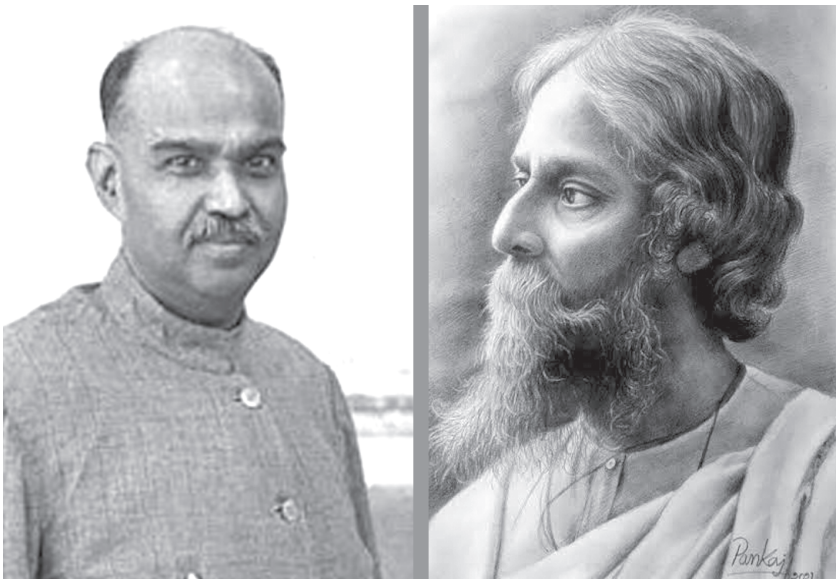
ওই দৃশ্য ধলাকর্তার ওপর কিন্তু কোনো রেখাপাত করে না, কেননা তিনি তাঁর আবেগের আত্মীয় পালঙ্কটিকে কখনই স্থানচ্যুত করবেন না এবং নিমিত্ত হবেন না। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের যে প্রসঙ্গ উঠেছিল তারই ফলশ্রুতিতে ধলাকর্তার ছেলে আগেই কলকাতায় চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে পুত্রবধূ চিঠিতে লিখছে আমাদের টাকার অনটন কাটাতে ওই পালঙ্কটিকে যদি বিক্রি করে কিছু অর্থ পাঠানো যায়। এতে প্রায় উন্মাদ হয়ে ওঠেন নিতান্তই ক্ষয়িষ্ণু জমিদার যাঁর আয় প্রায় নেই বললেই হয়। কিন্তু পালঙ্ক হস্তান্তরের কথা তাঁর কল্পনাতীত। এই সময়ই চিঠির জের টেনেই মকবুল অর্থের বিনিময়ে মনিবের তীব্র হতাশা ও বেদনার বহিঃপ্রকাশের মধ্যে পালঙ্কটি নিজের মাটির ঘরে নিয়ে যায়। মাটির ঘর ও অভিজাত পালঙ্কের পারস্পরিক বিপরীতাত্মক সহাবস্থান এই অসামান্য ব্যঞ্জনাময় দৃশ্যের সৃষ্টি করে। পরবর্তী সময়ে জানা যায় এমন বিড়ম্বিত ঘটনা পূর্ব পাকিস্তানে তখন নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে ওঠে। তাই অনেক পরে ছবিটি সম্পর্কে বলা হয় পরিচালক একজন 'underrated gem with high quality (Shyam Benegal) ছবিটি ১৯৭৫-এর জাতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি হিসেবে পুরস্কৃত হয়। ১৯৭৬ সালে বেঙ্গল ফিল্ম সাংবাদিক সংস্থা (BFJA) পুরস্কারও ছবিটি পায়। ২০০০ সালে ফেব্রুয়ারি ফিল্ম উৎসবে বিশেষভাবে বঙ্গভাগের ওপর নির্মিত চলচ্চিত্র হিসেবে এটি সম্মানিত হয়। আনন্দের কথা, ছবিটির সম্পূর্ণ সংলাপ ওয়েভ সিরিজে পাওয়া যায়। তবে দর্শক নগণ্য। তারা আত্মভোলা।

স্বাধীনতার প্রাক ও পরবর্তী সময়ের সন্ধিক্ষণে বহু সাহিত্য উঠে আসে কিন্তু সমাজের বিবর্তন ও চলচ্চিত্রে তার প্রতিফলন সেভাবে এল না। নতুন সৃষ্ট 'উদ্বাস্তু' শব্দটিকে প্রথম চলচ্চিত্রে সরাসরি নিয়ে আসেন রাজেন। আসন্ন সামাজিক ডামোডোল ও চিরস্থায়ী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সঙ্কেত সত্যদ্রষ্টার মতো তিনি পালঙ্ক ছবিটিতে তুলে আনেন। অভিজাত মুসলমান শ্রেণী তাদের দরিদ্র দেশবাসীকে যে কুটিলতায় নিরীক্ষণ করে তা আজও প্রত্যক্ষ হচ্ছে তাদের গৃহযুদ্ধে। এ প্রসঙ্গে হিন্দু বিদ্বেষের কথা নিষ্প্রয়োজন। শুধুমাত্র শিল্পের কারণেই শিল্প নির্মাণে চির অবিশ্বাসী রাজেনবাবু সমাজের শ্রেণী বিভেদ, কুসংস্কারগুলির ওপর আলোকপাত করেছেন তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট দিয়ে।

আজকের বাংলাদেশে জেহাদি আক্রমণে ক্রমহ্রাসমান হিন্দুর যে বিলাপ পদ্মা-মেঘনা পার করে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার আগাম অশুভ ইঙ্গিত রাজেনবাবু তাঁর জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পালঙ্ক ছবিতে দিয়ে গেছেন। হিন্দু সম্পত্তি আগ্রাসনের লালসাময় ইঙ্গিত আপাত নিস্তরঙ্গতার আড়ালে ক্রমবর্ধমান হতে দেখা যায়। পরিচালক কিন্তু তুমুল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে তাঁর ক্ষয়িষ্ণু জমিদারকে মুসলমান কর্মচারীর গৃহে সেই পালঙ্কটির প্রতি মমতায় পৌঁছে দেন। বাঙ্গালি হৃদয়ে যে চিরকালীন সমবেদনা ও স্বার্থহীন স্নেহের ধারা প্রবাহমান তারই স্বাভাবিক প্রতিফলন হিসেবে তিনি যখন তাঁর প্রাণপ্রিয় পালঙ্কে দুটি কচি শিশুকে নিদ্রিত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেন তখনই Melodramatic চলচ্চিত্রীয় উত্তরণে পালঙ্ক ও নিজের সমস্ত বিষয় আশয় মকবুলকে অবলীলায় দান করে দেন। ইতিমধ্যেই মোল্লাদের মধ্যে পালঙ্কটি অধিকার করা নিয়ে রেষারেষি বেধে যায়। রাজেনবাবু অব্যর্থ সঙ্কেত রেখে যান মুসলমান জাতিসত্তায় সহমর্মিতা প্রায় অনুপস্থিত। আমরা স্বাধীনতার পর থেকে আজ অবধি পূর্ববঙ্গের জনসংখ্যার ক্রমিক পতনেই তার প্রত্যক্ষ হিসেব পেয়ে যাই।

রাজেনবাবু ছিলেন বহুমুখী প্রতিভা ও বাংলা চলচ্চিত্রে তদানীন্তন সময়ে অপরিচিত সব বিষয় নিয়েই ছিল তাঁর নির্মাণ কার্য। কৈশোরের গ্রামীণ যাত্রাপালা থেকে শহরে অপেশাদারি থিয়েটার সবেতেই ছিল অবাধ গতি। আর্টিস্ট হিসেবে তাঁর ছবির অলঙ্করণ থেকে বিখ্যাত পরিচালকদের তুমুল বাণিজ্যসফল ছবির চিত্রনাট্য তিনি লিখেছেন। প্রখ্যাত পরিচালক তরুণ মজুমদারের 'সংসার সীমান্তে' (১৯০৭৫) সেরার পুরস্কার জেতে। এর পর তারাশঙ্করের কালজয়ী 'গণদেবতা'র চিত্রনাট্যও তাঁর কলমের সৃষ্টি। তরুণ মজুমদারের এই ছবিটিও বহু পুরস্কারে ভূষিত। এখানেই থেমে থাকেননি মানুষটি। বিখ্যাত 'ত্রয়ীর' পরিচালকদের অন্তর্গত মৃণাল সেনের আকালের সন্ধানে ও হিন্দি 'খণ্ডহর' ছবিতে তিনি অসাধারণ অভিনয় করেন। ভারত বিখ্যাত পরিচালক শ্যাম বেনেগালও তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারেননি নিজের 'আরোহণ' ছবিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় নিয়ে আসেন নিপাট অহঙ্কার ও প্রচার বিমুখ রাজেন তরফদারকে। পরিশেষে বলা যায়, ১৯৫৭ থেকে আমৃত্যু ১৯৮৭ সময়কালে তিনি মাত্র ৭টি ছবি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু বিষয় বিন্যাস ও বৈচিত্র্যে সেগুলি অনবদ্য।

'গঙ্গা' থেকে 'পালঙ্ক' হয়ে 'আকাশ ছোঁয়ার' Circus -এর পটভূমিতে চলচ্চিত্র বাংলায় কখনও হয়নি। চলচ্চিত্রের বিবিধ ক্ষেত্রে তাঁর পরিসর ছিল অনেক বড়ো এবং পারদর্শিতার চমৎকার নিদর্শন। হয়তো কালের বিরূপতায় চলচ্চিত্রের মায়াবী আলো সত্যজিৎ, ঋত্বিক, মৃণালের প্রায় সমকক্ষ হয়েও তাঁর ওপর বর্ষিত হলো না। তিনি যেন কিছুটা বৃত্তচ্যুতই রয়ে গেলেন। তবে তাঁর ছবির গানের ভাষায় কোটি কোটি বাঙ্গালি 'ইচ্ছা করে ও পরানটারে গামছা দিয়া বাঁধি'-র মতো তাঁকে স্মৃতিবন্দি করে রেখেছে। □



রবীন্দ্রনাথ ও শ্যামাপ্রসাদ
বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে ভিন্ন ভাবনার অনুরণন

ড: পঙ্কজ কুমার রায়

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২১ সালের ১ জুন ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা ভ্রমণকালে জার্মানির বার্লিনের Humboldt University-তে 'The Message of the Forest' শিরোনামে বক্তৃতা দেন। 'রবীন্দ্র জীবনকথা' গ্রন্থে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ''বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার দিন যে ভিড় হয়েছিল তা বর্ণনাতীত। পনেরো হাজার লোক ভারতীয় কবিকে দেখতে সমবেত হয়েছিলেন। একদিনে রেহাই পাননি, পরের দিনও কবিকে বক্তৃতা করতে হয়।''[১]

সেই বক্তৃতা বার্লিনে অবস্থিত Hotel Esplanade-এ ৪ জুন, ১৯২১ রেকর্ডিং করানো হয়। বক্তৃতার শেষে রবীন্দ্রনাথ নিজ কণ্ঠে 'মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি' গানটি রেকর্ড করান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বোমার আঘাতে গানের রেকর্ডটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে জার্মান প্রযুক্তিবিদরা গানটি পুনরুদ্ধার করেন। ১৯৫৯ সালে পূর্ব জার্মানির প্রধানমন্ত্রী অটো গ্রোটেভোল (Otto Grotewohl) ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তথা বিশ্বভারতীর আচার্য জওহরলাল নেহরুর মাধ্যমে বিশ্বভারতীয় হাতে তুলে দেন। গানটি Humboldt University-তে Alex Dunedis দ্বারা 'Kalinette des wissens' নাম দিয়ে তথ্যভাণ্ডারে সংরক্ষিত আছে। জার্মানি থেকে পাওয়া রেকর্ডটি বিশ্বভারতীতে কেমনভাবে সংরক্ষিত আছে তা অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ''The Message of the Forest, which Tagore gave in many places of his travels around Europe and North America, he refers to the Union of a World University where people from different cultures and religions form an academic community. Later that year he formed ''Vishva Bharati'' in Santi Niketan India.''[৩] পরবর্তী পর্যায়ে, বিশ্বকবি ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর বিশ্ব শিল্প ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে 'ব্রহ্মচর্য আশ্রম' গড়ে তোলেন। পরবর্তী পর্যায়ে কবিগুরু এই আশ্রমের নামকরণ করেন— 'বিশ্বভারতী', যা প্রকৃত অর্থেই বিশ্বশিক্ষার অঙ্গনে পরিণত হয়েছে। যেখানে পৃথিবী শান্তির নীড়ে বাসা বেঁধেছে 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' (Where the world makes a home in the nest.)। ২০২৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর 'ইউনেস্কো'র পক্ষ থেকে 'বিশ্বের প্রথম ঐতিহ্যবাহী এবং এখনও ক্রিয়াশীল বিশ্ববিদ্যালয়' (World's first 'living heritage University') হিসেবে কবিগুরু প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী

বিশ্ববিদ্যালয়কে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট'-এর স্বীকৃতি প্রদান করা হলো। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় বিশ্বের সাথে ভারতের যোগসূত্র গড়ে তুলবে। বিশ্বভারতী সেই ধারাই অক্ষুণ্ণ রাখবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।"[৪]

১৯৩২ সালের ২০ জুলাই সেনেট মিটিঙে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করার প্রস্তাবে বঙ্গদেশে বিতর্কের ঝড় ওঠে। ২১ জুলাই, ১৯৩২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন থেকে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে নিজের ক্ষোভ ব্যক্ত করেন।

শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

.....আমার দেশের লোক অনেকে আমার প্রতি নিষ্ঠুর, তাদের নির্মমতাকে জাগরুক করে তোলবার উপলক্ষ্য দিচ্ছি বলে মনে আমার সঙ্কোচ বোধ করছে। বুঝতে পারছি কঠিন প্রতিকূল দৃষ্টির সামনে আমাকে কাজ করতে হবে, পদে পদে অশান্তি ঘটবে— এমনতর অবস্থায় নিজের যোগ্যতা সপ্রমাণ করাও দুঃসাধ্য হবে। অতএব কী উপায়ে আমার শান্তি ও সম্মান যথোচিতভাবে রক্ষা হতে পারে সে কথা তোমাকেও আমার প্রতি মমতা রক্ষা করে চিন্তা করতে হবে। আমার শরীর এখন ক্লান্ত, বন্ধুর পথে নিরন্তর আঘাত সহ্য করে চলবার শক্তি আমার নেই—এই কারণে শঙ্কিত হয়েছি। কী করা কর্তব্য যথার্থ বন্ধুভাবে সে কথা চিন্তা করে পরামর্শ দিয়ো। দেশের কাছে আমার জীবনের যদি কোনো মূল্য থাকে তবে যাতে আমার মানহানি ও শান্তি নষ্ট না হয় সে কথা চিন্তা করা তোমাদের কর্তব্যই হবে।

২১ জুলাই ১৯৩২ ইতি —

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩ জুলাই, ১৯৩২ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট মিটিঙে ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশেষ অধ্যাপকরূপে আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রস্তাব নেওয়া হয় ঃ

''That Dr. Rabindranath Tagore be invited to accept an engagement with the University for two years with effect from 1st August, 1932.''

বিশেষ অধ্যাপক রূপে দু'বছরের জন্য ৫০০০ টাকা বাৎসরিক সাম্মানিক রামতনু লাহিড়ী ফান্ড থেকে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। সেনেট মিটিং থেকে ফিরে এসে চিঠি পাওয়ার পর ২৪ জুলাই, ১৯৩২, ৭৭ নম্বর আশুতোষ মুখার্জী রোড থেকে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন।

শ্রীচরণকমলেষু 77 Asutosh Mukherjee Road

Calcutta

২৪ জুলাই, ১৯৩২

যে কাজের জন্য আপনার সাহায্য ভিক্ষা করেছি, সে কাজ যথার্থ দেশের মঙ্গলকারক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হতে এইরূপ সংস্কারের দাবি আপনি বহুকাল হতে করে এসেছেন। আজ যখন বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে এই বৃহৎ কাজে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে, আপনি দ্বিধাশূণ্য মনে এই আহ্বান গ্রহণ করুণ, এই আমার প্রার্থনা।

ইতি

প্রণত ঃ

শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়[৫]

১৯৩৪ সালের ২০ জুলাই সর্বসম্মতিক্রমে শ্যামাপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতম উপাচার্য হন মাত্র ৩৩ বছর বয়সে। ১৭ জুলাই, ১৯৩৭ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতম উপাচার্যের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলায় দীক্ষান্ত ভাষণ দিতে গিয়েছিলেন।

''..... ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে কৃত্রিম কৌলীন্যগর্ব আদিকাল থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরে অন্তরে সংস্কারগত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরভাষাপ্রীত আভিজাত্যবোধকে অকস্মাৎ আঘাত করতে কুণ্ঠিত হলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের তুঙ্গমঙ্গ চূড়া থেকে তিনিই প্রথম নমস্কার প্রেরণ করলেন তাঁর মাতৃভাষার দিকে..... বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষান্ত থেকে বঞ্চিত আমার মতো ব্রাত্য বাংলা লেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দিয়ে আশুতোষ প্রথম রীতি লঙ্ঘন করেছেন; তাঁরই পুত্র সেই ব্রাত্যকেই আজকের দিনের অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করতে নিমন্ত্রণ করে পুনশ্চ সেই রীতিরই দুটো গ্রন্থি একাঙ্গে যুক্ত করেছেন। এতে বোঝা গেল বাংলাদেশে শিক্ষাজগতে ঋতু পরিবর্তন হয়েছে। পাশ্চাত্য আবহাওয়াতে শীতে আড়ষ্ট শাখায় আজ এক নব পল্লবের উৎসব।"[৭]

১৮৬১ সালের ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। ১৮৬৬ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রায়পুর জমিদারবাড়ির সন্নিবিষ্ট স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে নামকরণ করেন 'শান্তিনিকেতন'। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পাঠভবন' প্রতিষ্ঠা করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে প্রকৃতির সান্নিধ্যে প্রাচ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ব্রতী হন। ১৯১৬ সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখলেন, ''শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় বিশ্বের সাথে ভারতের যোগসূত্র গড়ে তুলবে।" বিশ্বভারতীর ভাবনা রবীন্দ্রনাথের মনে জার্মানি ভ্রমণের অনেক আগেই প্রোথিত হয়েছিল।

অপরদিকে ১৮৫৭ সালে ২৪ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের সংস্কার হয়। এই সংস্কারে বঙ্গদেশে ঝড় ওঠে। ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের তুষাগ্নি তখন থেকেই জ্বলছিল। বঙ্গভঙ্গ তাতে ঘৃতাহুতি দেয়। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পাঁচবার উপাচার্য হন (১৯০৬-১৯১৪, ১৯২১-১৯২৩)। ১৯২৪ সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর দশ বছর পর ১৯৩৪ সালে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কনিষ্ঠতম উপাচার্য নিযুক্ত হন। ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৭ প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেন, বাঙ্গলা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি পরীক্ষায় স্বীয় গৌরবময় আসন অধিকার করিয়াছে। পুত্রই পিতার প্রকৃত উত্তরাধিকারী। উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্র কেবল যে পিতার বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী

ARYA TOURIST LODGE

Just 5 Minute walk from New Delhi Rly. Station
Only 1 km. from Cannaought Place
Homely Atmosphare
Day & Night Taxi Facilities

8526, Ara Kashan Road, Ram Nagar, Pahar Ganj
New Delhi - 110055 (India)

Phones : +91 11 43505463 (10 Lines)
Cont : 9811044543

E-mail : info@aryatouristlodge.in
website : www.aryatouristlodge.in

Phone : 2573 0416
2572 4419

BIKANERVALA

10181-82, Chowk Gurdwara Road
Karolbagh
NEW DELHI-110005

Our Speciality

PISTA LAUJ & BADAM KATLI,
BENGALI SWEETS & NAMKEENS

হয়, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু যে পুত্র পিতার কার্য চিন্তা ও ভাবধারার অধিকার লাভ করে— সেই পুত্রই পিতার উপযুক্ত পুত্র। স্যার আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহার উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন, শ্রীমান শ্যামাপ্রসাদ তাহার স্বাধ্যায় গাহিয়া বাংলাভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথ সম্পৃক্ত হন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সারস্বত সাধনার অঙ্গন থেকে বিশ্বশিক্ষা অঙ্গনে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুলে বঙ্গ-বাঙ্গালি ও ভারতকে বিশ্বদরবারে গৌরবান্বিত করেন।

The Viswa Bharati Bill (1950) আইনসভার কক্ষে পেশ করা হয় ২৮.৪.১৯৫১। বিলটি নিয়ে আইনসভায় তুমুল বিতর্ক হয়। ডঃ মুখার্জী তাঁর ভাষণে বলেন, ''বিশ্ববিদ্যালয়কে কলেজ ও ভবন বা ছাত্রাবাসগুলি পরিচালনার অথবা স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়গুলির ঠিক কী অবস্থান হবে? এই বিলটি স্পষ্টতই কলেজগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার অর্থ ম্যাট্রিকুলেশন স্তরের পরবর্তী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে পাশ হওয়া মাধ্যমিক শিক্ষা বিল অনুযায়ী রাজ্যের সমস্ত উচ্চ বিদ্যালয় পর্ষদের (বোর্ডের) নিয়ন্ত্রণে আসবে। তাহলে শান্তিনিকেতনে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলির কী হবে? আমি সুনিশ্চিতভাবে এই মত পোষণ করি যে, বিশ্বভারতীকে যদি কিন্ডারগার্টেন স্তর থেকে নিজস্ব বিদ্যালয় পরিচালনার অধিকার দেওয়া না হয়, তবে এই বিল এবং বিশ্বভারতী উভয়েই চরমভাবে ব্যর্থ হবে। শান্তিনিকেতনে এক অভিনব ধারার মাধ্যমিক শিক্ষাদান করা হয়, যা প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক বিশেষ অবদান।''

বিশ্বভারতীকে আর পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীতে ফেলতে চেয়েছিল বিশ্বভারতী বিল। সিংহগর্জনে ডঃ মুখার্জী বলেন, ''প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্যগুলিকে সংশোধন করা আমাদের কাজ নয়। তা করার কোনো অধিকার আমাদের নেই। আপনারা যদি বলেন যে, আপনারা এই উদ্দেশ্যগুলি স্বীকার করেন না, তবে বিলটি পাশ করবেন না। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীর যে উদ্দেশ্য বা আদর্শ হওয়া উচিত বলে মনে করেছিলেন, সেই আদর্শের ভিত্তিতে সরকার বিশ্বভারতী বিলটি পাশ করতে প্রস্তুত নয়।'' রবীন্দ্রনাথ বলতেন, বিশ্বভারতী হলো এমন এক তরীর মতো যা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সখাদের ভার বহন করে চলেছে।'' স্ত্রীর শেষ সম্বল গহনা বিকিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নের শিক্ষাসৌধ নির্মাণ করেছিলেন। অবশেষে শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন, বিলটি প্রস্তুত হয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে এবং সেখানে 'স্কুল' শব্দটির উল্লেখ ছিল না। অর্থাৎ পেশ করা বিলে শুধু কলেজ ও উচ্চতর শিক্ষার প্রসঙ্গই আসছে।'' ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত না করলে বিশ্বভারতীর স্কুলশিক্ষা রবীন্দ্রচিন্তার বাইরে চলে যেত, যা রবীন্দ্রনাথ কখনোও চাননি।

তথ্যসূত্র ঃ ১। জীবন কথা, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, ২। রবীন্দ্রজীবনী, প্রশান্ত কুমার পাল, আনন্দ, ১৪০৭, অষ্টম খণ্ড, ১১৪–১১ ISBN : 81-7756-141-3 ৩। www.lautarchiv.hu-berlin.de ৪। রবি তীর্থের হেরিটেজ স্বীকৃতি, পঙ্কজ কুমার রায়, বিতর্ক Cons, সেপ্টেম্বর, ২০২৩। ৫। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ, শতবর্ষের আলোকে শ্যামাপ্রসাদ, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্মারক সমিতি, সৃষ্টি প্রকাশন, ২০২২, পৃঃ ৪১, ৬। তদৈব পৃঃ ৪১-৪২, ৭। ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৭, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীক্ষান্ত ভাষণের অংশবিশেষ।

(লেখক যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী কলেজের অধ্যক্ষ)

With Best Compliments from -

NITIN ENTERPRISES

Engineers & Die Castings

HAND TOOLS

D-138A, Phase-V, Focal Point, Ludhiana

M: 9814025239, 9814126239

(O) 0161-2676985

মানবজমিন

গার্গী দেব



বোশেখ মাসের মাঝদুপুরে মুরাইডিহির শাল-মহুয়ার জঙ্গলটা যেন খাঁ-খাঁ করছে। সূর্যদেবের অগ্নিঝরা দৃষ্টি থেকে রেহাই নেই কারোর। রুক্ষ গরম হাওয়ায় গায়ে ছ্যাঁকা লেগে যায়, প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত লু চলে। শুকনো পাতার রাশি গরম হাওয়ায়

দুরন্ত বেগে উড়ছে এদিক-ওদিক। এরই মাঝে হিংস্র সরীসৃপের সরসর শব্দ। লোকে বলে মুরাইডিহির জঙ্গলে সাবধান। সর্বক্ষণ সেখানে মৃত্যুদূতের আনাগোনা। দিনে-রাতে সেখানে চরে বেড়ান তেনারা। যত নাম, ততই বাহার তাদের, খরিশগোখরো, শঙ্খচুড়, কালকেউটে। আর রাতে শোনা যায় চিতার হুঙ্কার। হলেই বা! ঝুমরি আর মুংরুদের ওসব গ্রাহ্য করলে চলে না। পেটের টানে ওদের মৃত্যুকে পরোয়া করলে চলবে না। এখন আবার হোটেল মালিকদের কাছে শুকনো শাল, গরান, মহুয়া পাতার খুব চাহিদা। জ্বালানি গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না, তাই বস্তা প্রতি দোকানিরা দশ টাকা করে দিচ্ছে। সেই জন্য পাতা কুড়ানোর তাগিদে খুব সকালে উঠে ওরা জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।

আজ যেন সকাল থেকেই আগুন ঝরছে। কোন্ সকালে নুন লঙ্কা দিয়ে মেটে আলু সিদ্ধ খেয়ে দুজনে বেরিয়েছে। ঝুমরি আর মুংরু। ঘরে ওদের পান্তাভাতেরও সংস্থান নেই। সারাদিন এই কাঠফাটা রোদে জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে মারাংবুরুর কৃপায় দুটো বস্তা ভরলে দিনের শেষে সাঁঝের বেলায় জুটতে পারে দু'মুঠো ভাতে ভাত। দেবতার উদ্দেশে ওরা কপালে হাত ঠেকায়। ওরা অরণ্যের সন্তান। জঙ্গলই ওদের অন্ন দেয়, আশ্রয় দেয়। ওদের শীর্ণ শরীরে জীর্ণ মলিন কাপড়, কাঁধে দুটো বড়ো বড়ো বস্তা, হাতে লাঠি। খিদে তেষ্টা পেলে ঝোরার জল ছাড়া গতি নেই। ঝুমরি আর মুংরু তা-ই করল। দিনের অর্ধেকের বেশি চলে গেছে, একটামাত্র বস্তা ভর্তি হয়েছে। বাকি এখনও পুরো দুটো বস্তা। মারাংবুরু কৃপা না করলে আজ পেটে বোধহয় ভাত জুটবে না। ক্ষুধায় অশক্ত শরীরটা একপাও চলতে চায় না, তার উপর সূর্যদেবতার রোষ। হায়! গরিবদের জন্য কি তার মনে কোনও দয়া নেই? ক্ষুধার জ্বালায় অসহায় অশ্রুতে তাদের দু'চোখ ভরে যায়। আঁজলা ভরে মুখে-চোখে ছিটিয়ে দেয় ঝোরার ঠাণ্ডা জল। ভিজিয়ে নেয় মুখ-হাত-পা। ক্লান্ত পা দু'টো চালিয়ে দেয় নতুন উদ্যমে। চোখে ভাসতে থাকে এক থালা গরম ভাতের স্বপ্ন।

ঝোরার ধারের জায়গাটা ছায়াময়। মুংরু হাতের লাঠিটা দিয়ে গরানগাছের তলাটা খোঁচাতে থাকে। হঠাৎ প্রচণ্ড গর্জন করে দু'হাত ফণা তুলে দাঁড়িয়ে পড়ে এক প্রকাণ্ড খরিশগোখরো। সভয়ে একলাফে পিছিয়ে আসে মুংরু। ওর হাতটা আঁকড়ে ধরে ঝুমরু— 'ঘর চল্ রে মুংরু, আজ আর জঙ্গলে গিয়া কাম নাই। বেলা পড়ে এল, সাঁঝের বাতাস বইছে। দিনটো ভালো ঠেক্ছে নাই রে।' কিন্তু পেটের ক্ষিদের কাছে হার মানে মনের দুর্বলতা আর ভয়। সভ্য মানুষের কাছে ভয় বিলাসিতা, কিন্তু গরিব জনজাতিদের কাছে পেটের তাগিদে ভয় পাত্তা পায় না।

—'ভয় কী রে ঝুমরি, আমি তো আছি তুর সাথে।' নির্ভয়ে মুংরু এগিয়ে চলে গরানগাছটার তলায়। এখানে প্রচুর পাতায় বস্তাটা প্রায় পুরোটা ভরে গেল। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওদের সরল মুখগুলো। এদিক-ওদিক করে আর কিছুটা ভর্তি করে ওরা বন থেকে বেরিয়ে বড়ো রাস্তায় ওঠে। গরমে পিচ গলে গেছে, হাঁটা যায় না। ওরা লালমাটির রাস্তা ধরে এগিয়ে যায়।

ক্লান্তিতে ওদের পা চলে না। রাস্তার ওপারেই একটা ঝাঁ চকচকে রেস্তোরাঁ, মাংস আর অন্যান্য সুখাদ্যের লোভনীয় সুগন্ধ আসছে। ওরা আর থাকতে পারে না, 'শুকনো পাতা লিবেন বাবু? তিন বস্তা দিব বাবু, সদ্য কুড়িয়ে আনলাম জঙ্গল থিক্যা গো।' ওদের মলিন কাপড়চোপড়, বাতাসে উড়ছে রুক্ষ নোংরা চুল, অসহায় মুখে ফুটে উঠেছে দুরন্ত খিদের গন্ধ।

রাস্তার পাশে লাইন দিয়ে রাখা দামি গাড়িগুলো থেকে নেমে আসছিল বিলাসবহুল ধনী বাবুলোক। তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাল। ওদের মধ্যে একজন মন্তব্য করল—'ভারতে দারিদ্রসীমা দিন দিন বেড়ে চলেছে, এত বিরক্তিকর'। ওদের মনে বিরক্তি। আর ঝুমরিদের ক্ষুধার তীব্রতা, গায়ের ঘামের গন্ধ, সীমাহীন দারিদ্র, অভিযোগহীন সহ্যশক্তি, অপর্যাপ্ত সততা আর সারল্য— সবই বাবুদের অসহ্য। তবু মুংরুরা মানুষ। মারাংবুরুর কৃপায় ওদের মধ্যেই বইছে স্বচ্ছ মানবিকতার রক্ত।

—'আরে না, না, এখানে ওসব লাগবে না। ওইদিকে যা বরং।' ম্যানেজার দয়াপরবশত হাত নেড়ে কাছেই একটা ঝুপড়ির দিকে দেখিয়ে দিল। ঝুমরি আক্ষেপ করে বললো—'ওরা কত্তো বড়োলোক, ধনী, আমাদের ওরা ঢুকতে দেবে কেন?'

রাস্তার পাশে ছন্নছাড়া পাইস হোটেলে শেষ বিকেলের হাঁড়ি চড়েছে। ঝুমরিদের আর তর সয় না। বস্তাগুলো জমা দিয়ে রংচটা, ভাঙা বেঞ্চিতে বসে পড়ে একপাশে দুজনে সঙ্কোচে। একটু পরেই এসে যায় অ্যালুমিনিয়ামের থালায় ভাত, আলুর চোখা আর জলের মতো ডাল। পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে তাই তারা গোগ্রাসে খেতে থাকে। খাওয়ার



পর ঢক্‌ঢক্‌ করে বেশ খানিকটা জল খেয়ে নেয়। ড্রামে রাখা জলে হাত মুখ ধুয়ে মুংরু ম্যানেজারের কাছে পয়সা মেটাতে যায়।

—'দে, দুজনের পঁচিশ টাকা করে পঞ্চাশ টাকা। বস্তার জন্য দিলাম তিরিশ টাকা। আর বাকি কুড়ি টাকা দে।' নির্বিকারভাবে কথাগুলো বলে হাত বাড়ায় দোকানি।

মুংরুর মুখ নিমেষে রক্তশূন্য—'সে কী কুথা বাবু, ডাল ভাত তো কুড়ি টাকা বটে।'—'আর আলুটা? সেটা কি তোর ফিরি? যত্তোসব! রাগে উত্তেজিত দোকানি খিঁচিয়ে ওঠে। হাতজোড় করে মুংরু কাকুতি মিনতি করতে থাকে। সে সবের কোনো পাত্তাই দেয় না দোকানি।

চিৎকার চেঁচামেচিতে দোকানের সামনে লোক জমে যায়। সামনের দামি রেস্তোরাঁ থেকে চারটি যুবক বেরিয়ে এল। সামনেই দাঁড় করানো ছিল ওদের ঝকঝকে লাল মারুতি। বোধহয় কলেজের ছাত্র ওরা। বন্ধুরা মিলে বেড়াতে বেরিয়েছিল। ঘটনা সব জেনে প্রত্যেকেই পকেট থেকে পঞ্চাশ-একশো টাকার নোট বাড়িয়ে দিল মুংরুর দিকে, 'আহা, গরিব মানুষ। নে ভাই, কাঁদিস না।' মুংরু হুমড়ি খেয়ে পড়ল ছেলেটির পায়ে।

—'না বাবু, হামরা ভিখারি নয়। হামরা রুপেয়া চাই না। বাবু, হামরা খেটে খাই। বেইমানি করি না বাবু।' ঝুমরি আর মুংরু কাঁদতে থাকে অঝোর ধারায়।

নিদারুণ দারিদ্রে অসহায়তায় এই জনজাতি মানুষটির সততায় ছেলেগুলো অবাক হয়ে গেল। নোংরা গামছার খুঁটে চোখের জল মুছে মুংরু দোকানির পা দুটো জড়িয়ে ধরল—'হামরা বেইমান নয় গো বাবু। কাল এসে পাতার বস্তা দিয়ে বাকি দাম মিটিয়ে দিয়ে যাব। বাবু দয়া করুন গো, বাবু।'

ছেলেগুলির চোখ ছলছল করছিল। কে বলে মানুষ আর নেই আজ। আজও বেঁচে আছে মানুষ জীবনের প্রতিটি প্রান্তে। আজও আছে দয়া-মায়া-করুণা।

—'শোন্‌রে ভাই, কাঁদিস না। তোর কুড়ি টাকা আমরা মিটিয়ে দিয়ে গেলাম। কুড়ি টাকার জন্য এই গরমে তোদের কাল আসতে হবে না, বুঝলি? এখন বাড়ি ফিরে যা, আর কাল দুপুরে ওই হোটেলে এসে মাংস-ভাত খেয়ে যাবি। নে, এই টাকাগুলো রেখে দে। মনে রাখিস—দয়া আর ভিক্ষা এক জিনিস নয়। দয়ার মধ্যে আছে ঈশ্বরের দাক্ষিণ্য আর ভিক্ষার মধ্যে থাকে তাচ্ছিল্য মেশানো দয়া।'

মুংরির মনে হলো ওদের মধ্যে যেন মারাংবুরুর মুখের ছবি ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। পায়ে লুটিয়ে পড়ে দেবতার উদ্দেশে ওরা প্রণাম জানায়। মিষ্টি হেসে মারুতিতে উঠে পড়ল ওরা। কালো পিচের রাস্তার বাঁকে শাল মহুয়ার অরণ্যের ফাঁকে লাল মারুতিটা ধীরে ধীরে দূরে, অনেক দূরে মিলিয়ে গেল। □

011-32306597
011-30306592

SNEH RAMAN
ELECTRICALS PVT. LTD.
E-12, Sector - XI, Noida -201 301,
Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.)
Ph. : 91-0120-3090400, 91-0120-3090401,

Manufacturer :

Power Transformers ● Furnace Transformers ● Voltage Stabilizer-Manual/Servo ● D.C. Drive ● Control Panels HT/LT/Metering ● Distribution ● Automatic Starters upto 500 H.P. ● Turn Key Projects ● Electrical-Mechanical ● OrderSupplier● Traders (Heavy Electrical Repair's)

Regd. Office : W.Z. 3227, Mohindra Park, Shakur Basti, Rani Bagh, Delhi

With Best Compliments from -

SANT VALVES PVT. LTD.

G.T. Road, By-pass,
Jalandhar
Pin - 144012 (PB.) India

Mfrs. of **SANT**
IBR CERTIFIED : BRONZE, CAST IRON, CAST STEEL, FORGED STEEL, BOILER MOUNTINGS
IST MARKED : GM VALVES, CI BALL VALVES, SLUICE VALVES, BUTTERFLY VALVES, **'SBM'** BRONZE INDUSTRIAL VALVES
Ph. +91 181-5084693-94-95, 2603308
FAX : +91-181-5062270
E-mail : info@santvalves.com
Website : www.santvalves.com

With Best Compliments from :-

M/s. Sant
Steel Forgings
Private Limited

G. T. Road Bye Pass
Jalandhar - 144012
Tel. 0181-2601719

Phones : Fac : 2222224, 2222225,
2222226
Resi : 2426562, 5050350

Rai KNITWEARS

842/2, Industrial Area - A,
Backside R.K. Machine Tools Ldt.
LUDHIANA - 141003

HOSIERY MANUFACTURERS
& EXPORTERS OF:

EXCLUSIVE SCHOOL
UNIFORMS & T-SHIRTS
ALL FASHION WEARS

With Best Compliments from -

SHILPA METAL INDUSTRIES

AN ISO CERTIFIED COMPANY 9001:2015

B-5, Friends Industrial Estate. Opp. Aarti Steels,
Focal Point, Sherpur, Ludhiana - 141010

Manufactures of High Quality SHOVELS & FASTENERS

Phone ; +91 98559 77770,
E-mail : salesexport@muwo.co.in, abhishekgsmi@gmail.com
Website : www.muwo.co.in

With Best Compliments from :-

RAJKUMAR KARWA

Managing Director

SANAUTO ENGINEERS (INDIA) PVT. LTD.

Manufacturers of

ENGINEERING COMPONENTS

AEROSPACE, OIL & GAS, AUTOMOTIVE

789, Industrial Estate, Sector - 69

Faridabad - 121 004, Haryana

Tel. : 91 129-2989789 / 790

Website : www.sanauto.com

E-mail : info@sanauto.com